তাজমহলে এক কাপ চা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
তাজমহলে এক কাপ চা / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র
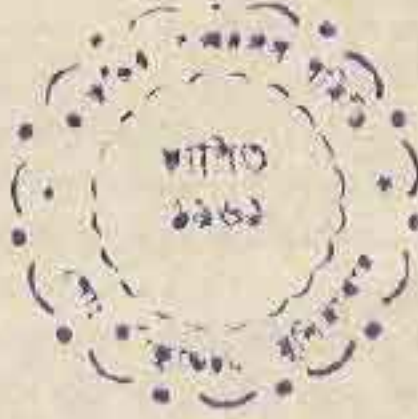
তাজমহলে এক কাপ চা

রাম রাম ওস্তাদজী! কুছ খুন খবর শুনাইয়ে!

ওস্তাদজীর পরনে একটা আলখাল্লার মতন পোষাক, নানান জায়গায় তাপ্পি মারা, মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। গালে পাঁচ-সাতদিনের কদু দাড়ি। বয়েস হবে পঞ্চাশের ধারে কাছে। কোথায় তার বাড়ি ঘর কিংবা তার নিজের বৌ-বাচ্চা আছে কিনা তা কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করলে মৃদু মৃদু হাসে।

মাঝে মাঝে সে এসে উদয় হয়। খাটিয়ায় বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করে। আপদ-বিপদে শলা-পরামর্শ দেয়। দু'একদিন এর তার বাড়িতে থাকে, ছাতু কিংবা রুটি আর ভেণ্ডির তরকারি যা দেওয়া হয় তাই-ই আরাম করে খায়, আবার উধাও হয়ে যায়।

গত বছর খরার সময় এ গাঁওয়ের ঠিকাদার বড় বে-শরম, কঠিন-হৃদয়ের মতন ব্যবহার করেছিল। ঐ সময় বাঁধ বাঁধার কাজ কি বন্ধ রাখা ঠিক? জমিতে ধান নেই, হাতে পয়সা নেই, তখন সরকারি মজুরি না পেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? সেই সময় ওস্তাদজী এসে ঠিকাদার ব্যাটাকে ভারি জব্দ করেছিল। সবাই এক জোট হয়ে তাকে এক খেজুর গাছের নিচে ঘিরে রেখে চব্বিশ ঘণ্টা দানা পানি ছুঁতে দেয় নি!

ওস্তাদজী এসে যে-দু-একদিন থাকে তখন নানা রকম মজা হয়। সারাদিন খাটা খাটুনি তো আছেই, একেবারে শেষবার চোখ বোজার আগে পর্যন্ত বাঁচার জন্য খেটে যেতে হবে, এটাই নিয়তি। কিন্তু খাটতে খাটতে আনন্দ ফুর্তির কথা মনে থাকে না। ওস্তাদজী সেটাই মনে করিয়ে দেয়। পিঠে চাপড় মেরে বলে,

আরে খাজ-খাব তো আছেই লেকিন তা বলে হাসবি না! খালি না জঙ্গলের জানোয়ার আর আকাশের পাখী, তারাও নাচ-গানা করে।

ওস্তাদজী এসে প্রতি সন্ধ্যেবেলা সবাইকে জড়ো করে মজলিশ বসায়। সে নিজেই গান গায়। গলায় বিশেষ সুর নেই কিন্তু চাঁচামেচির জোর আছে, একটা হাত কানে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। ঐ গানের জন্যই তার নাম ওস্তাদজী।

ওস্তাদজীর আলখাল্লার পকেটে একটা খবরের কাগজ। ওস্তাদজী পড়ে-লিখে আদমি, এই গ্রামের বাইরে যে দেশ, যে পৃথিবী, তার খবর সে রাখে। এমনকি একদিন আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, ঐ আসমানে, অনেক অনেক উঁচুতে, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছোয় না, সেখানেও নাকি মানুষ লড়াই-এর জন্য তৈয়ার হচ্ছে। কে জানে, ওস্তাদজী মজাক্ করার জন্য গপ্ বানায় কি না!

ওস্তাদজীর গলা শুনে আরও দু'চারজন এসে জমায়েত হলো সেখানে। বুড়ো রামখেলাওনের খাটিয়া ঘিরে তারা মাটিতে উবু হয়ে বসে। সবাই এক এক করে রাম রাম জানিয়ে অনুরোধ করে, বলো ওস্তাদজী, তোমার আখবরে কী খুশ খবর আছে?

ওস্তাদজী খাটিয়ার এক পাশে বসে বলে, আরে দূর। আখবরে তো তোর-আমার মতন গরিব মানুষের কথা লেখে না। শুধু বড় বড় শেঠ আর মিনিস্টারদের কথা থাকে। তা শুনে কী করবি?

বুড়ো রামখেলাওন ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, ওস্তাদজী, গরিবের জীবনে আছেটা কী যে আখবরে লিখবে? গরিবের খবর আমরাও শুনতে চাই না। তুমি শেঠ আর মিনিস্টারজীদের কিস্‌সাই শুনাও।

ফুলসরিয়া নামে একটি বউ বললো, গত বারে তুমি আম্রিকা নামে একটা কোন গাঁওয়ের খুব মজাদার একটা কাহানী শুনিয়েছিলে, সে রকম আর একটা বলো!

তার স্বামী ধনিয়া বললো, আচ্ছা ওস্তাদজী, ইন্দিরাজীর লেড়কা রাজীবজী তো এখন গদ্দিতে বসেছে, ঠিক কি না? তা রাজীবজীর কটা লেড়কা আছে? কত বড়? ধরো যদি, ভগোয়ান না করে, রাজীবজী আচানক খতম হয়ে যায়....

কয়েকজন হাসতে থাকে, কয়েকজন চোখ বড় বড় করে উদ্বেগের সঙ্গে তাকায়। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, ওস্তাদজীর একটা মতামত এই বিষয়ে শুনতে চায় তারা।

আজ কোনো কাজ নেই। আকাশ থমথমে, তাই চাষের কাজ শুরু হয় নি, এখন শুধু বৃষ্টির প্রতীক্ষা। অলস সময় বয়ে যায়।

নানারকম গল্প করতে করতে ওস্তাদজী হঠাৎ বললো, কেউ এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?

সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে হায় হায় করে ওঠে। ছি ছি, কী লজ্জার কথা, মানুষটা নিজের মুখে কথাটা বললে, সামান্য এক কাপ চা, কিন্তু কী করে তা খাওয়ানো যায়? এখানে তো কোনো বাড়িতে চায়ের চল নেই।

ওদের মুখের ভাব দেখেই ওস্তাদজী ব্যাপারটা বুঝলো। শহরে গিয়ে গিয়ে ওস্তাদজীর চায়ের নেশা হয়েছে। সে হাত তুলে বললো, থাক, থাক। চায়ের দরকার নেই। এক গিলাস পানি দাও কেউ। তারপর আমি শুনাবো এক শেঠজীর কিস্‌সা।

এক নওজোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পাক্কীতে এক পাঞ্জাবীর হোটেল আছে, সেখান থেকে আমি নিয়ে আসছি চা। কেউ একটা বর্তন দাও!

পাক্কী মানে পাকা সড়ক, হাইওয়ে। এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে। ফুলকি ছুটে যাবে আর আসবে।

ধনিয়া বললো, অতদূর থেকে চা আনবি, তাতে তোর খাস গরম হবে কিন্তু চা-সে ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা চা খেতে একেবারে বিল্লির পেশাবের মতন।

যেন সে সত্যিই কখনো বিড়ালের পেচ্ছাপ পান করেছে, সেই রকম একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে, হেসে ওঠে সবাই।

ফুলসরিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, কেন, আমরা চা গরম করে দিতে পারি না? যা, যা, ছুটে যা!

রামখেলাওন বললো, একটা বড় বর্তন নিয়ে যা। বেশি করে আনিস।

ওস্তাদজী নওজোয়ানের দিকে হাত তুলে বলে, দাঁড়া।

তারপর সে চুপ করে থাকে। কিছু বলে না। তার কপালে কী যেন একটা ভাবনার রেখা ছোটাছুটি করছে।

একটু পরে খাটিয়া ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুই কেন একলা যাবি? চল, আমরা সবাই মিলে যাই। এখানে বসে থেকে কী হবে? পাক্কী দিয়ে কত গাড়ি যায়, কত ট্রাক এক হাজার, দু হাজার মাইল যায়, ওগুলো দেখলেও ভালো লাগে। ঠিক কি না!

অনেকে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ করে বললো, চলো, চলো, চলো!

তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন জুটে গেল। খবর পেয়ে আরও দু-চারজন ছুটে আসে।

রামখেলাওন বললো, আরে আরে, এত আদেখলার দল নিয়ে যাওয়া হবে কোথায়? এত চায়ের পয়সা দেবে কে?

ওস্তাদজী হাত তুলে বললো, চলুক, সবাই চলুক, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ফুলবাগিয়া বললো, ওস্তাদজী যেতে বলেছে, তবু তুমি বখেড়া করছো ? ওস্তাদজীর কথার দাম নেই ?

একটি অকারণের মিছিল। অলস জীবনে একটি আকস্মিক পিকনিক। পার্কীতে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায় এদিকে একটা দূরের দেশ আছে, ওদিকে আর একটা দূরের দেশ। এর মধ্যে একটা দিকে এদেশের রাজধানী। মাইলের হিসেবে পঁচিশ-তিরিশ মাইল হলেও আসলে অনেক দূর।

পার্কীতে পৌঁছে আরও আধ মাইল ডানদিকে হেঁটে সর্দারজীর দোকান পাওয়া গেল। কিন্তু সে দোকানের ঝাঁপ ফেলা। দেখলে মনে হয় সে দোকানে বেশ কিছুদিন কেনাবেচা বন্ধ আছে।

ধনিয়া কপাল চাপড়ে বললো, হায় রাম। এই কথাটা আমার মনে ছিল না ? অমৃতসরে কী যেন গোলমাল হয়েছে, সর্দারজীরা খুব রেগে আছে, অনেক সর্দার ভাগলপা হয়েছে। ইন্দিরাজীর দেহান্ত হবার পর এই সর্দারজীকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর দু'একজন বললো, ঠিক ঠিক। দোকানটা তো বেশ কিছুদিন বন্ধ।

সবার মুখে শোকের ছায়া। পিকনিকটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ওস্তাদজী আজ নিজে সবাইকে চা খাওয়াতে চাইলেন।

ওস্তাদজী বললো, কই ফিকির নেই। এ দোকান বন্ধ তাতে কী হয়েছে, আরও তো দোকান আছে। চল, সামনে চল।

রামখেলাওন বললো, আর কোথায় যাবে ওস্তাদজী ? যত সামনে যাবে তত শহর এসে যাবে। সেখানে দোকানে দাম বেশি। তা ছাড়া আমরা কুর্তা পরে আসি নি, পায়ে জুতা নেই, আমাদের ঢুকতেই দেবে না।

আরও কয়েকজন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মনেও এই চিন্তা এসেছে। রাস্তার ধারের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবু চা খাওয়া যায়। ভালো দোকানে তাদের ঢুকতে দেবে কেন ?

ওস্তাদজী বললো, আরে কুর্তা-জুতা কি চা খাবে, না মানুষ চা খাবে।

মুখে তার এক গভীর হাসি ফুটে উঠলো। যেন একটা নতুন বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করে গোল করে মুখের সামনে এনে সে তাতে ফুঁ দিলো চুম্বন দেয়। তারপর বললো, চল, তোদের আজ আমি তাজমহলে চা পিলাবো !

ওস্তাদজী মাঝে মাঝে এমন কথা বলে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। তাজমহলটা আবার কী জিনিস ! এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ধনিয়ার মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব আছে। সে বললো, তাজমহল হচ্ছে বাদশাদের এক বহুৎ ভারি মোকাম। আমি ফটো দেখেছি। ঠিকাদারবাবুর গাড়িতে ক্যালেণ্ডারে ছিল।

ওস্তাদজী বললো, ঠিক বলেছিস। তোরা আকবর বাদশার নাম শুনেছিস ? শুনিস নি। সেই আকবর বাদশার ছাওয়াল তার বেগমের জন্য একটা মস্ত বড় কুঠি বানিয়েছিল। এই রোদ্দুরের মতন সফেদ। বহুৎ চমকদার।

একজন খচুড়ি করে বললো, সেখানে আমরা যাবো কেন ? বাদশা কি আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ?

ধনিয়া বললো, আরে, বাদশা-বেগমদের জমানা খতম। তারা আর নেই। তাও জানিস না ?

একজন বললো, তাহলে নিশ্চয় সেখানে এখন মন্ত্রীজীরা তাদের বিবিদের নিয়ে থাকে ?

ওস্তাদজী বললো, না রে, সে কুঠি এখন পাবলিকের জিনিস। তোর আমার মতন বেবস আদমিরাও সেখানে যেতে পারে।

তবু অনেকের সংশয় ঘোচে না। সে জায়গা কত দূর ? সেখানে চা খেতে কত পয়সা লাগবে ? ফেরা হবে কখন ?

ওস্তাদজীর মুখে মিটিমিটি হাসি। সে পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে তার নাকের সামনে নাচাতে লাগলো।

আরে, কেয়া তাজ্জব ! ওস্তাদজীর জামি দারা আলগাছার জেব থেকে বেরুলো একশো টাকার নোট ? লোকটা ভানুমতীর খেল্ জানে নাকি ?

—এটা কী দেখালে, ওস্তাদ ? কোথায় পেলে ?

—তোরা আমাকে কী ভাবিস ? আমি একেবারে কাল্লু ? এটা আমি গান গেয়ে ইনাম পেয়েছি।

আবহাওয়া আবার হালকা হয়ে যায়। অনেকেই হাসতে শুরু করে। ওস্তাদজীর গান শুনে কেউ টাকা দিয়েছে, এটা সত্যি বলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু একশো টাকার নোটটা সত্যি। এখনো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি।

ধনিয়া বললো, ওস্তাদজী, তুমি ঐ টাকাটা আমাদের জন্য খরচ করবে !

—আমি টাকা জমাই না। আচানক পেয়েছি। একদিনেই ফুঁকে দিতে রাজি আছি।

—তা হলে এক কাজ করো না। এত টাকা, চা খেয়ে কী হবে ? মন্দিরে পূজা দাও।

—দূর পাগলা ! আমি শুধু পেট পূজার কথা জানি, আর অন্য কোনো পূজা

খাবি না।

—শোনোই না কথাটা। দেওতার কাছে একটা খাসী কিংবা একটা ভঁইস মানত করো। তারপর আমরা সবাই মিলে সেই মাংস খাবো!

—একশো টাকার খাসী কিংবা ভঁইস হয়? একটা-দুটো ছুছুন্দর হতে পারে!

ফুলসরিয়া বললো, আমার মরদটা সব সময় কাজের কথা বলে। ওসব মাংস-টাংসের কথা থাক। বেঁচে থাকলে একদিন দুদিন মাংস ঠিকই খাওয়া যাবে। ওস্তাদজী ঐ যে হাওয়া মহল না কোন মহলের কথা বললো, আমি সেখানেই গিয়ে চা খেতে চাই!

অনেকেরই সেই মত হলো। বাড়ি ফেরার তাড়া তো নেই, তাই সামনের দিকে এগিয়ে চললো এই গ্রাম্য বাহিনী। রাজধানীর দিকে।

খানিকদূর যাবার পর তারা দেখলো রাস্তা দিয়ে একটা লোক ডুগডুগি বাজিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে একটা লোম ওঠা, রোগাটে ভালুক আর দুটো বাঁদর। ওস্তাদজী এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, কেয়া দোস্ত, কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি ওস্তাদজীর মুখ চেনে বোঝা গেল। সে বললো, আমার কি দিকের ঠিক আছে। যখন যেদিকে খুশি যাই। তুমি এই দলবল নিয়ে চললে কোথায়?

ওস্তাদজী বললো, আমরা এক জায়গায় চা খেতে যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তোমাকে পেয়ে খুব ভালো হয়েছে।

ভালুকওয়ালা বললো, এত লোক যাচ্ছে শুধু চা খেতে?

—চলোই না। ভালো চা খাওয়াবো। সে রকম চা বাপের জন্মে খাওনি!

একজন কেউ চেঁচিয়ে বললো, আমরা তাজমহলে চা খেতে যাচ্ছি।

লোকটি থমকে দাঁড়ালো। কাঁধ থেকে ওস্তাদজীর হাতটা নামিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলো তার চোখের দিকে। সে বহুদর্শী মানুষ। সে চট করে মানুষের মুখের কথায় ভুলে যায় না।

সে জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটা তাজমহলের কথা কী বললো? কোথায় চা খেতে যাওয়া হচ্ছে?

ওস্তাদজী মুচকি হেসে বললো, তাজমহলে।

লোকটি বললো, আমাকে কি বুদ্ধু পেয়েছো? আমি তাজমহল চিনি না? আমি সব চিনি। তাজমহল তো অনেক দূরে? এদিকে তো রাজধানী!

ওস্তাদজী বললো, আরে দোস্ত, চলোই না। তুমিই তো বললে তোমার দিকের ঠিক নেই। না হয় রাজধানীতেই গেলে।

—কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত তুমি পয়দলে যাবে নাকি! মানুষ তো হার, আমার

ভালুক-বাঁদরগুলো থকে যাবে।

—তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

উল্টোদিক থেকে তিনটে ট্রাক আসছে। ওস্তাদজী দু হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে। তার দেখাদেখি আরও অনেকে।

এই সব রাস্তায় এক-আধজন মানুষ সামনে পড়লে ট্রাক থামে না, চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এখানে প্রায় চল্লিশ জন নারী পুরুষ। বিকট শব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল তিনটে ট্রাক।

তিনটিতেই ভর্তি আছে ছাগল। ট্রাক ড্রাইভাররা নেমে দাঁড়িয়ে ভাবছে এটা আবার কোন পার্টির চাঁদার ব্যাপার!

ফুলসরিয়া জিজ্ঞেস করলো, ওস্তাদজী এরা এত খাসী নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

ওস্তাদজী বললো, রাজধানীতে। সেখানকার মানুষের এই অ্যাত্ত বড় খিদে। গাঁও গাঁও থেকে চুন চুন করে সেই জন্য ওরা খাসী, মুর্গী, গরু, মাছ, দুধ সব নিয়ে যায়। মেয়েমানুষও নিয়ে যায়।

—তাদেরও খায় নাকি!

—হা-হা-হা-হা! তুমহার ডর নেই, ফুলসরিয়া, আমরা এতজন আছি, তুমহাকে কেউ খেতে পারবে না!

এগিয়ে গিয়ে ওস্তাদজী ট্রাক ড্রাইভারদের সামনে হাত জোড় করে বললো, ভাই সাহাব, বেরে দোস্ত, মেহেরবানী করে আমাদের একটু রাজধানী পৌঁছে দেবে?

এই উৎকট প্রস্তাব শুনে কিন্তু ট্রাক ড্রাইভাররা খুশিই হলো। এই হারামজাদাগুলো রাস্তা আটকে বসে থাকলে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ এসে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা, তাতে অনেক খরচের ধাক্কা। তা ছাড়া এরা চাঁদাও চায় নি।

প্রথমে জায়গা নেই বলে খানিকটা গাঁইগুঁই করলো তারা। তারপর কিছু ভাড়া পাওয়া যাবে কি না তার ইঙ্গিত করলো। ওস্তাদজী বললো, তার লোকজন ছাগল কোলে করে বসতে পারে, তাতে জায়গা হয়ে যাবে। ভাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই, তবে রাজধানীতে পৌঁছে সে ট্রাক ড্রাইভারদের চা খাওয়াতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তারা রাজি হলেও আপত্তি হলো ভালুক আর বাঁদর দুটিকে নিয়ে। ওস্তাদজী বললো, বেচারা ভালুকটার চেহারা দেখেছো। তোমার এক একটা খাসী ওর চেয়ে বড়। ওকে দেখে কেউ ভয় পাবে না। চলো, চলো, আর দেরি নয়।

ফুলশরিয়া আর কয়েকটি মেয়ে দারুণ খুশি। প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে এ একটা দারুণ মজা। ওস্তাদজী না হলে এরকম বুদ্ধি আর কে দেবে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে কে জানে। কুছ পরোয়া নেই।

দু'একজন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে। অন্যরা সঙ্গে হাততালি দেয়। কত মজা, কত ফুর্তি! কী যে চা-খাওয়ার একটা ভেল্কি তুললে ওস্তাদজী, তাতেই আজকের দিনটা বদলে গেল।

দূর থেকে রাজধানীর স্কাইরেখা দেখে সবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন স্বর্গপুরী। এখানে আকাশও যেন নিচু।

এই দলের দু' দশ জন অবশ্য আগেও কয়েকবার রাজধানীতে এসেছে জন-মজুরের কাজ করতে। কিন্তু সে অন্য রকম আসা। আজ যেন তারা রাজধানী জয় করতে যাচ্ছে।

ফুলশরিয়া জিজ্ঞেস করলো, ওস্তাদজী, তাজমহল তো সবচে বড়া কোঠী। সেটা এখান থেকে দেখা যাবে না!

—দেখবে, দেখবে। ঠিক সময়ে দেখবে। তখন তুমহারে আঁখ ঠিকরে যাবে, ফুলশরিয়া।

রাজধানীর উপকণ্ঠে ট্রাক ড্রাইভার তাদের নামিয়ে দিল। আর যেতে তাদের মানা আছে। ওস্তাদজীর চা খাওয়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো তারা।

সেই মায়াপুরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চললো ওস্তাদজীর দলবল। বাপরে বাপ কত কিসিমের হাওয়া গাড়ি আর কত পুলিশ! ইস, ওস্তাদজী যদি আগে বলতো তবে যার যার ভালো পোশাক পরে আসতো। ফুলশরিয়ার একটা গোলাপফুল-ছাপা শাড়ি ছিল। তার বদলে সে পরে এসেছে একটা মামুলি হলদে শাড়ি। তাও আবার ছেঁড়া। কোনো মানে হয়?

ওস্তাদজী মাঝে মাঝে রাস্তার লোকদের কী যেন জিজ্ঞেস করছে। তার খুব সাহস, সে পুলিশদের সঙ্গেও কথা বলতে দ্বিধা করে না। কত রাস্তায় যে ঘোরা হলো তার ঠিক নেই। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় দোকানের সামনে এসে ওস্তাদজী বললো, থামো! এহি হ্যায় তাজমহল!

অনেকেই হতাশ হলো। তারা ভেবেছিল, বাদশা বেগমের ব্যাপার, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক অন্যরকম কিছু হবে। কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ? এই বাড়িটা বেশ বড় বটে কিন্তু এরকম বড় বাড়ি তো তারা আসতে আসতে বেশ কয়েকটা দেখেছে। এর থেকেও বড় বাড়ি দেখেছে। রোজ্জুরের মতন শক্তেও তো না এটা?

ধনিয়া বললো, এহি?

আবুকল্যান ওস্তাদজীকে বললো, কেন দিল্লাগী করছো, ওস্তাদ? এই তোমার তাজমহল? এ তো একটা হোটেল!

ওস্তাদজী বললো, হাঁ, হোটেলই তো। হোটেল ছাড়া চা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

—সে কথা আগে বলো নি কেন?

—আগে বললে এই সব আমার সাথীরা ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু আমি কিছু ঝুট বলি নি। এই হোটেলের নাম তাজমহল। বিশ্ওয়াস না করো তো তুমি ঐ দারোয়ানকে পুছকে দেখো!

হোটেলের কথা শুনে অনেকেই ঘাবড়ে গেছে। এতবড় হোটেলে ঢোকার সাহস তাদের নেই। ওস্তাদজী একশো টাকার নোট দেখিয়েছে বটে, একশো টাকা কম কিছু নয়, আবার বেশিও নয়। এই টাকায় একটা ভৈঁস বা বঁদীও পাওয়া যায় না। এতবড় সাহেবদের হোটেলে কি এই টাকায় চা পাওয়া যাব? পাওয়া গেলেও তাদের ঢুকতে দেবে?

হোটেলে হেড দারোয়ানের চেহারা আগেকার কোনো নবাব-বাদশার মতনই। নাকের নিচে প্রকাণ্ড গোঁফ, মাথায় নিভাঁজ পাগড়ি, গায়ে মখমলের জামা। হাতে একটা ছোট লাঠি, তার মুণ্ডিটা পেতলের হলেও সোনার মতন চকচকে। এতগুলো নোংরা-ছেঁড়া পোশাক পরা, খালি-পা ভিখিরি দেখে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, আবে হে-হে-রে-রে, ভাগ, ভাগ, হিঁয়াসে।

সেই বজ্র গর্জন শুনে চুপসে গেল অনেকের মুখ। একজন আরেক পেছনে লুকোবার চেষ্টা করলো, সবাই পেছন চায়।

ওস্তাদজী কিন্তু এগিয়ে গেল সামনে, একেবারে হেড দারোয়ানের মুখোমুখি। বিনা দ্বিধায় সেই মখমলের জামা পরা বুকে হাত রেখে মিষ্টি হেসে বললো, হামলোগ কাস্টোমার হ্যায়, কাস্টোমার! পায়সা দেবো, খানাপিনা করবো। তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছো কী?

হেড দারোয়ান তবু বললো, ভাগো, ভাগো! শেঠ কিলিয়ার করো!

ওস্তাদজী বললো, আরে দাদা, তুমি কাস্টোমারকে ফিরিয়ে দিচ্ছো কী? ডাকো তোমার মালিককে। তার সঙ্গে বাৎচিৎ হবে!

হোটেলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ততক্ষণে। স্টুয়ার্ট, ছোট ম্যানেজার, বড় ম্যানেজার সব সন্ত্রস্ত মুখে শলা-পরামর্শ করছে, এ কিসের হামলা? কী ভাবে এই উৎপাত রোখা যায়। হোটেলের নিজস্ব গার্ড আছে, তবু ফোন করা হলো পুলিশকে। হোটেলে কত সাহেব-মেম আছে, কত শেঠ-আমির আছে, তাদের নিরাপত্তা চাই। এই হোটেল কী এমন দোষ করলো যে গাঁ থেকে গুণ্ডা-বদমাশরা এলো হোটেল ঘেরাও করতে?

হোটেলের ছোট ম্যানেজার দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গার্ড ও পুলিশদের উদ্দেশে বললো, রিমুভ দেম! ক্লিয়ার দা গেটস!

ওস্তাদজী চেঁচিয়ে বললো, কী বলছেন ম্যানিজার সাব? ইংলিশমে ব্যাত ম্যাত করছেন কেন? কোনো সাহেব কি আপনাকে পয়দা করেছে? আপনার গায়ের রংটি তো আমারই মতন!

ছোট ম্যানেজার বললো, টুম লোগ ইহাঁসে চলে যাও! হল্লা মাৎ করো! নেহি তো পুলিশ তুম লোগকো পুশ করে গা।

ওস্তাদজী বললো, ইয়ে ক্যা আজিব বাত বলছেন, ম্যানিজার সাব! আপনি কাস্টোমারদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন? আমি কানস্টিটিউশান পড়ে নিয়েছি, তাতে কোথাও লিখা নেই হোটেলে ঘুষতে গেলে গায়ে জুতা পরে আসতে হবে। পয়সা দিব, খাবো, ব্যাস!

—এ হোটেলে তুমলোগ খেতে পারবে না, দুসরা হোটেলে যাও।

—কেন খেতে পারবো না? সব কাস্টোমারকে কি তোমরা বলো, আগে রূপিয়া দেখাও? কানস্টিটিউশানে এ কথাও লিখা নেই।

ছোট ম্যানেজার তাড়াতাড়ি সরে গেল আরও বড় থানায় ফোন করতে।

চোখের নিমেষে এসে গেল গাড়ি গাড়ি পুলিশ। আর তাদের জাঁদরেল চেহারার কর্তারা।

এত পুলিশের সমারোহ দেখে গাঁও-এর লোকেরা একেবারে ঘাবড়ে-টাবড়ে অস্থির। তারা আর্ত চিৎকার করে বলছে, এ তুমি কী করলে ওস্তাদজী? তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমরা এতদূর এলাম। চা-পিলাবার নাম করে তুমি কি আমাদের মার খাওয়াবে? পুলিশ আমাদের ফাটকে ভরে দিলে খেতির কাজ কাম কী করে হবে? বালবাচ্চারা কী খাবে?

ভালুকওয়ালার হাত থেকে ডুগডুগিটা নিয়ে ডুগ-ডুগ, ডুগ-ডুগ করে বাজিয়ে এক হাত তুলে ওস্তাদজী বললো, শুনো ভাইয়ো আউর বহেনো, মরদকা বাৎ হাতিকা দাঁত। আমি তুমাদের জবান দিয়েছি কি তাজমোহেল হোটেলমে চা পিলাবো। এমন বড়িয়া চা জীবনে খাওনি। যারা ডরপুক তারা পিছে হঠে যাও! যারা আমায় বিশওয়াস করো, তারা আমার সঙ্গে থাকো!

একটা গুঞ্জন উঠে আবার থেমে গেল। একজনও পিছিয়ে গেল না। ডরপুক বদনাম কে নিতে চায়? ওস্তাদজী তাদের ভালো বেসে, সে ইচ্ছে করে তাদের বিপদে ফেলবে না। এত কেন সেই ঠিকাদারকে খোয়াব করার মতন একটা মজাদার ব্যাপার!

পুলিশের এক কর্তা এগিয়ে এসে ওস্তাদজীকে বললো, তুমি এদের লিডার? তুমি এ পাশে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ওস্তাদজী বললো, তোমার মতন ছোটামোটা দারোগার সঙ্গে কী কথা বলবো? কমিশনার সাহেবকো বোলাও, নেহিতো প্রাইম মিনিস্টারজী কো বোলাও। যে-লোকে কানস্টিটিউশান পড়েছে, তাদের সঙ্গে কথা হবে!

ছোট লোকের এই স্পর্ধা দেখে রাগে টকটকে হয়ে গেল পুলিশ কর্তার মুখ। একটু বাইরের দিকে হলে এদের পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেওয়া যেত। দু-চারটে লাশ পড়লেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এটা রাজধানী, এখানে শত শত বিদেশী দূতাবাস, কত খবরের কাগজের লোক, কী থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক নেই। হোম মিনিস্টার খচাখচ সাসপেণ্ড করে দেবে!

পুলিশের কর্তার সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজারদের আবার পরামর্শ হলো। এই ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দেবার একটাই উপায় আছে। ভিখিরিগুলো বাগানের শোভা নষ্ট করছে, যত তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করা যায়, ততই মঙ্গল।

বড় ম্যানেজার এবারে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক হায়, তুই লোগ চা খেতে এসেছো, এই হোটেল ম্যানেজমেণ্ট অ্যাজ এ গুড উইল জেশ্চার তোমাদের চা খাওয়াবে। ফ্রি অফ কস্ট। তোমরা গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, চা পাঠানো হচ্ছে।

গাঁয়ের লোকেদের মুখে হাসি ফুটলো। ওস্তাদজীর জয় হয়েছে। সত্যিই তাদের চা খাওয়া হবে।

ওস্তাদজী হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের স্বরে ম্যানেজারকে বললো, আরে ছোঃ! আমরা কি ভিখারী নাকি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাবো? স্বাধীন নাগরিক, পয়সা দিয়ে খেতে এসেছি, ভিতরে কুর্সীতে বসবো, টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে আরাম করবো, তবে না!

দলবলের উদ্দেশে ডাক দিয়ে সে বললো, চল, চল, অন্দর চল!

সবাই হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওস্তাদজীর অনুসরণে।

ভেতরের টেবিলে টেবিলে বসে ছিল দেশ বিদেশের ধনী সাহেব মেমরা, আর পাক্কা সাহেবী পোশাক পরা কালো রঙের দিশি সাহেবরা। সবাই আঁতকে উঠলো, হুড়োহুড়ি ঠ্যালাঠেলি পড়ে গেল। গাঁওয়ের মানুষ দখল করে নিল সব টেবিল চেয়ার।

ওস্তাদজী বললো, এ ধনিয়া, একটো বিড়ি ছাড়। দেখলি তো!

সবাই বললো, ওস্তাদজীকা জয়!

গলায় কালো বো বাঁধা একজন স্টুয়ার্ড ওস্তাদজীর সামনে এসে ভদ্রকরিন গলায় বললো, বেয়ার, আপনারা চা খেতে চান, ঠিক আছে, চা দিচ্ছি। কিন্তু

একটা ভাল্লুক আর বাঁদর নিয়ে হোটেলে ঢোকার তো নিয়ম নেই। ওদের বাইরে রেখে আসুন।

ওস্তাদজী আলখাল্লার পকেট থেকে খপ করে খবরের কাগজটা বার করে সেই কর্মচারীর চোখের সামনে প্রথম পৃষ্ঠাটা মেলে ধরে বললো, এটা কিসের তসবির আছে? দেখো, আচ্ছা সে দেখো! চিনতে পারো না।

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ভাল্লুকের ছবি!

ওস্তাদজী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শুনো, ভাইয়ো আর বহেনো, এই যে ভালুকের ছবি দেখছো, এটার মালিক এই হোটেল! হাঁ, আমি ঠিক কথা বলছি। আখবরে সব লিখা আছে। এই হোটেল এই ভালকোটাকে পাঠিয়েছে ফরাসী সাহাবদের মুলুকে। সেখানে হোটেলে হোটেলে এই ভালকো খেল্ দেখাবে! আমি ঝুট বলি না, সাচ বাৎ বলি, এখানে সব লিখা আছে। এই হোটেল যদি আজুবুলো হোটেলে ভালকো পাঠায়, তবে আমরা কেন এখানে আমাদের ভালকো আনতে পারবো না? আলবাৎ আনবো।

সবাই হা-হা হো-হো করে হেসে সমর্থন জানালে ওস্তাদজীকে। সাহেবদের হোটেলে যদি ভালুক যায়, তবে দিশি হোটেলে কেন আসবে না?

পুলিশ চেষ্টা করছে টেলিফোনে হোম মিনিস্টারকে ধরতে। কিন্তু তিনি বেপাত্তা। লাঠি, টিয়ার গ্যাস না-গুলি কোনটা চালানো হবে, সে নির্দেশ কেউ দিতে পারছে না। তার থেকে এদের চা খাইয়ে দেওয়াই ভালো।

টেবিলে টেবিলে দামি দামি অ্যাসট্রে আর ফুলদানি। এ বাটারা নির্ঘাৎ ওগুলো চুরি করবে। ম্যানেজারের নির্দেশে বেয়ারারা সেগুলো সরিয়ে নিতে এলো।

ওস্তাদজী একজন বেয়ারার হাত চেপে ধরে বললো, আরে নোকর! তুই বড় লোকের নোকর হয়েছিস বলে কি তোর জাত পাল্টে গেছে? তোর বাপ-দাদা কোনদিন মেহনত-মজুরি করে নি? তুই আমাদের পছানতে পারছিস না? কানস্টিটিউশানের কোথায় লিখা আছে যে হোটেলে এসে সিগ্রেটের ছাই ঝাড়া চলবে লেকিন বিড়ির ছাই ঝাড়া চলবে না? ভাগ ভাগ।

তারপর তুড়ি মেরে সে স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললো, ওহি কাগজ লাও, যে কাগজে সব চিজের নাম আর দাম লিখা থাকে!

টেবিলে টেবিলে মিনিউ কার্ড পড়ে আছে, তার একখানা তুলে দেওয়া হলো ওস্তাদজীর হাতে। সে মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভান করে বিড়বিড় করে বললো, শালা ডাকু! একটা ভুখা মুর্গা, তার কিমৎ বেড়শো রুপেয়া। এক গিলেট পানাম, পচ্চিশ রুপেয়া! ডাকু! হারামখোর! না:, আমরা শুধু চা খাবো।

চা আনো চল্লিশ কাপ।

দু তিনটি সাহেব সাহস করে ভেতরের দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। তাদের হাতে ক্যামেরা। ওস্তাদজী তাদের ডেকে বললো, আও, আও, তসবির খিঁচো।

রোগা প্যাংলা তুলীরাম নামের একজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, ইনকা তসবির লেও! রাজীবজী বলেছি মুলুক আর আফ্রিকায় গেছেন ফ্যাশান করনে কে লিয়ে। জাদুঘর থেকে সব পাথরের মূর্তি নিয়ে গিয়ে সাহেবদের ভারত দেখাচ্ছেন। উয়ো তো পুরানা জমানার ভারত হ্যায়! ইয়ে তুলীরামকে দেখো। ইয়ে হ্যায় নয়া জমানাকা ভারত!

পুলিশ এসে সাহেবদের সরিয়ে দিল। বিদেশীদের যখন তখন ছবি তোলার নিয়ম নেই। তাছাড়া কখন ভায়োলেন্স শুরু হয়ে যায়, তার ঠিক কি! ঐ লোকগুলো টেবিল চাপড়ে হাসি মস্করা করছে। ওদের চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

বড় বড় পটে করে চা এলো। বেয়ারা সেই চা কাপে কাপে ঢালতে যেতেই ওস্তাদজী বললো, রোখো! তুম যাও!

তারপর সে ফুলবরিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, দেবী ফুলবরিয়া, আজ তুমিই এই তাজমহলের বেগম। তুমি নিজের হাতে সবাইকে চা বেটে দাও।

সকলেই এক একটা কাপ পাবার পর সুড়ুৎ সাবাৎ শব্দে চা টানতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, আঃ! মজা আ গিয়া! কী সুন্দর বাস, এমন চা বাপের জন্মে খাই নি। ধন্য তুমি, ওস্তাদজী!

শুধু ফুলবরিয়ার চোখে জল।

ওস্তাদজী তাকে জিজ্ঞেস করলো, এ কী ফুলবরিয়া, তুম রোতে কিঁউ? কিসের দুঃখ হয়েছে তুমহার?

ফুলবরিয়া ধরা গলায় বললো, বড় আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদজী। আমি একটা দেহাতী কামিন। আমায় এত সম্মান কেউ কখনো দেয় নি।

—তুমি নিজে হাতে দিলে তাই চায়ে এত বেশি সুবাস, আরও যেন মিঠা লাগলো। ঠিক কি না!

সবাই বললো, ঠিক ঠিক!

ভালুকওয়ালা বললো, আরে, তোমরা সব চা খেয়ে নিলে, আমার ভালুক আর বান্দর দুটোকে একটু দিলে না?

তাই তো, তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। সবাই তাদের কাপ থেকে একটু একটু ঢেলে দিল প্লেটে। সেই চা ভালুক আর বাঁদর দুটোকে খাওয়ানো হলো।

চা খেতে খেতে চকচক করতে লাগলো নির্জীব ভালুকটার চোখ। এমন ভালো জিনিস তো সে কখনো খায়নি! আবার যেন সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ওস্তাদজী ভালুকটার সামনে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, নাচ ভালুকো, নাচ! নাচ রে মুন্না নাচ!

সবাই মিলে হাততালি দিতে লাগলো ভালুকটাকে ঘিরে।

প্রথম নারী

বেশি দূরে নয়, হয়তো গড়িয়া বা টালিগঞ্জ বা দমদমে কারুর বাড়িতে গেছি। সেখানে এখনো কিছু ফাঁকা জায়গা আছে, গাছপালা আছে, একটা ছোটো পুকুর আছে। সে রকম জায়গায় যদি হঠাৎ খুব জোর বৃষ্টি নামে, আমি জানলার কাছে কিংবা ঢাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, চোখ ভরে দেখি হাওয়ার ধাক্কায় গাছগুলোর এলোমেলো নাচ, আর ঘাসভরা মাঠের ওপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ শুনতে শুনতে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার এই রকম একটা বর্ষার দিনের কথা।

প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক বছরই তো বর্ষা আসে। জীবনের যতগুলি বছর আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি ততগুলি বর্ষা ঋতু দেখে যাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্যে কত রকম মনে রাখবার মতন ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু আমার শুধু বিশেষ একটা বর্ষার কথাই মনে গেঁথে আছে।

কত বয়েস হবে তখন আমার, আঠেরো কিংবা উনিশ। ছোটকাকাদের একটা বাড়ি ছিল গালুডিতে। প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় ছোটকাকা আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে। কী কারণে যেন আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে। কী কারণে যেন আমাদের যাওয়া হতো না। ছোটকাকার সঙ্গে আমরা কোনোদিনই গালুডি যাইনি। একবারই মাত্র গেছি গালুডিতে, তাও পুজোর সময় নয়। কেন যে গ্রীষ্মকালে ঐ রকমের জায়গায় যাওয়া ঠিক হয়েছিল তা এখন মনে নেই।

ছোটকাকা আমাদের চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন, আর মানিক নামে একটা

চিঠি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাবা যেতে পারলেন না। বাবার অফিসের গোডাউনে আগুন লেগে গিয়েছিল হঠাৎ, তখন তাঁর কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলে না। আমাদের টিকিট কাটা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক হলো, মাকে নিয়ে আমরা ভাইবোনেরা চলে যাবো, বাবা কয়েকদিন পরে আসবেন।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই আমি হয়ে গিয়েছিলাম হেড অফ দা ফ্যামিলি। মা ও ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব আমার ওপর।

গালুডিতে ভাদুকাকাদের বাড়িটা ছিল বেশ ফাঁকা জায়গায়, স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে। ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে পেছনে বাগান, পাঁচিলের ওপাশে ঢেউ খেলানো প্রান্তর। ঐ সব জায়গায় গ্রীষ্মকালে কেউ বেড়াতে যায় না। অনেক বাড়িই তালা বন্ধ ছিল।

সারাদিন কাজ তো কিছু নেই, বাগানে খানিকটা খেলাধুলো আর নানারকম খাওয়ার চিন্তা। দুপুরে অসহ্য গরম বাতাস, বাইরে বেরুবার উপায় নেই। অত গরমে ঘুমও আসে না। রাস্তায় পোস্টম্যানের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শুনলেই মনে হতো আজ কি চিঠি আসবে? কিন্তু প্রত্যেকদিন কে চিঠি লিখবে আমাদের? বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, তাঁর আসতে আরও কয়েকদিন দেরি হবে।

বালক থেকে সাবালক পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলুম বলে আমার সব সময় নতুন কিছু একটা করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু গালুডির মতন নির্জন জায়গায় কীই বা করার থাকতে পারে। মাঝে মাঝে ট্রেনে চেপে চলে যেতুম ঝাড়গ্রাম কিংবা ঘাটশিলা, কিছু কেনাকাটি করবার জন্য। কেনাকাটি আসল উদ্দেশ্য নয়, গালুডিতেও মোটামুটি সব জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে আমি যখন ইচ্ছে একা একা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারি সেটাই ছিল একটা উত্তেজনার ব্যাপার।

ঐ রকম বয়েসে বেশির ভাগ ছেলেই লাজুক হয়। আমি অচেনা লোকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে পারতাম না কিছুতেই। গালুডির তুলনায় ঝাড়গ্রামে লোকজন অনেক বেশি, সেখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতুম রাস্তায় রাস্তায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। ঘাটশিলাতেও একদিন গিয়ে দেখি সুবর্ণরেখার ধারে এক দল ছেলেমেয়ে পিকনিক করতে এসেছে ঐ গরমের মধ্যে। তারা অনেকেই আমার বয়েসী। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ দেখছিলুম ওদের। ওরা খেলছে, হাসাহাসি করছে, নিজেরাই রান্না করছে উনুন ধরিয়ে। আমার ইচ্ছে করছিল, ওদের দলে মিশে যাই। কিন্তু ওরা আমায় ডাকেনি, ডাকলেও বোধহয় আমি লজ্জায় ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতুম না। নিজেকে দারুণ একা মনে হতো।

গালুডিতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি দু-তিনখানা বাড়িই একেবারে ফাঁকা। সেইজন্য আমাদের খুব ডাকাতের ভয় ছিল। সন্ধের পরই দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকতুম ভেতরে। সেইজন্যই সন্ধেগুলো আরও অসহ্য বোধ হতো। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারটি যেমন বুড়ো, তেমন রোগা, আমরা ওর নাম দিয়েছিলুম লটপট সিং। ডাকাত কেন, সামান্য একটা চোর এলেও বোধহয় ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যেত না।

একদিন বিকেলবেলা আমরা বাইরের বাগানে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় দেখলুম আমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন মহিলা আর একটি বাচ্চা ছেলে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা?

আমি ওদের চিনি না, আগে কখনো দেখিনি। ওরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

আমরা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলুম। এ পর্যন্ত গালুডিতে আর কেউ আমাদের বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকেনি।

আজও আমি সেই দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। একেবারে সামনে রয়েছেন তরুণী, নীল শাড়ি পরা, বেশ লম্বা চেহারা, পিঠের ওপর চুল খোলা, তাঁর পাশে লাফাতে লাফাতে আসছে পিন্টু, তার বয়েস সাত বছর, কালো হাফ প্যান্ট আর হলুদ গেঞ্জি পরেছে সে। তাদের পেছনে, একটু ব্যবধান রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে এলা, যেন তার ভেতরে আসবার ইচ্ছে ছিল না। এলা পরে আছে একটা হরিণ-রঙা শাড়ি। সমস্ত দৃশ্যটা আমার স্মৃতিতে যেন একটা বাঁধানো ছবি, যদিও তখন আমি তাদের নাম জানতুম না।

প্রথম মহিলাটি একেবারে কাছে এসে হাসিমুখে মাকে বললেন, মাসিমা, আমায় চিনতে পারছেন? আমি রত্না।

মা তখনও চিনতে পারেননি, কৌতূহলের সঙ্গে একটু একটু হাসি মিশিয়ে চেয়ে রইলেন।

মহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন, সেই যে গড়পারে আমরা—

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ও, তুমি রত্না! সত্যি চিনতে পারিনি প্রথমটায়, এসো, এসো!

একটুক্ষণ কথাবার্তাতেই সব বোঝা গেল।

আমরা এক সময় গড়পারে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতুম। সে প্রায় দশ বারো বছর আগেকার কথা। আমারই সে বাড়িটার কথা ভালো করে মনে নেই, আমার ছোট বোন তখন জন্মায়নি। রত্নাদিরা থাকতেন পাশের ফ্ল্যাটে। আমাদের

থাকার সময়েই রত্নাদি নতুন বৌ হয়ে এসেছিলেন সেখানে। সেইটুকুই আমার মনে আছে যে বিয়ের কোনো উৎসব হয়নি, খাওয়া-দাওয়াও হয়নি, তবু সে বাড়িতে একজন নতুন বৌ এসেছিল। বাড়িতে এবং পাড়াতে সেটা ছিল একটা আলোচ্য বিষয়। আমারও শিশু মনে একটা খটকা লেগেছিল।

শৈলেনদা আর রত্নাদি এক অফিসে চাকরি করতেন। একদিন সন্ধেবেলা রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ওরা একসঙ্গে গড়পারের বাড়িতে চলে আসেন।

আমার মায়ের সঙ্গে রত্নাদির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। রত্নাদিদের নতুন সংসার সাজিয়ে দিতে মা সাহায্য করেছিলেন কিছু কিছু। রত্নাদি সেই সব কথাই বলতে লাগলেন উচ্ছ্বসিতভাবে।

রত্নাদির বিয়ের পর আমরা ঐ গড়পারের বাড়িতে ছিলুম মাত্র এক বছর। তারপর উঠে যাই ভবানীপুরে। রত্নাদিরাও এখন ঐ বাড়িতে থাকেন না।

রত্নাদি এলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, মাসিমা, এ আমার ছোট বোন, আপনি দু' একবার দেখেছেন ওকে, অবশ্য ও তখন খুবই ছোট ছিল...

মা বললেন, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে, খুব দুরন্ত ছিল তখন, এখন দেখছি খুব শান্ত!

এলা শুধু শান্ত নয়, প্রায় নির্বাক বলা যায়। একবার শুধু সে মায়ের কোনো একটা প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছিল, সেটা না শুনলে ওকে বোবা মনে হতেও পারতো।

একটু লম্বাটে মতন মুখ এলার, শ্যামলা রং, চোখ দুটি খুব টানাটানা। রোগা আর গম্ভীর। চোখ তুলে সে মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকায়, চেয়েই থাকে, কোনো কথা বলে না।

মা রত্নাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরাও এই প্রথম এখানে বেড়াতে এসেছো? আমাদের তো পুজোর সময় আসার কথা ছিল, তখন হয়ে উঠলো না, সেই জন্যই তো... তাও তো উনি আসতে পারলেন না...

রত্নাদি একটুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, মাসিমা, শৈলেন খুব অসুস্থ। আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবো তা জানি না।

আমি বিষম চমকে উঠেছিলুম। কী শান্তভাবে কথাটি বলেছিলেন রত্নাদি। গলার আওয়াজে কোনো রকম দুঃখ বা উচ্ছ্বাস নেই, যেন জীবনের অনেক ঘটনার মতন এটাও একটা সাধারণ ঘটনা। এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো মানে নেই।

আমরা যে পরিবেশে মানুষ, সেখানে কোনো স্ত্রীকে প্রকাশ্যে তার স্বামীর নাম

উচ্চারণ করতে শুনতুম না সেই সময়ে। কিন্তু রত্নাদি অনায়াসে শৈলেন কথাটা উচ্চারণ করলেন, যেন সেটা তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম।

রত্নাদির ঐ কথা শুনে এলা এক দৃষ্টিতে তার দিদির দিকে তাকিয়েছিল, কোনো কথা বলেনি। লিলু তখন একটু দূরে আমার ছোট বোনের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে।

শৈলেনদার যে ঠিক কী অসুখ তা বুঝলুম না। তবে শুনলুম যে উনি শুকনো জায়গায় এলে ভালো থাকেন। রত্নাদি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। পুরো গ্রীষ্মের তিন মাস এখানে কাটিয়ে যাবেন। ওরা এসেছেন দেড় মাস আগে।

মা রত্নাদিদের চা খাওয়ালেন। তারপর ওঁরা যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন মা আমাকে বললেন, ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে আয় তো, নীলু।

রত্নাদি হেসে বললেন, আমাদের এগিয়ে দিতে হবে না, এতদিনে আমাদের পথ চেনা হয়ে গেছে।

তারপরেই মত বদলে আবার বললেন, আচ্ছা এসো নীলু, আমাদের বাড়িটা চিনে যাবে। মাসিমাকে নিয়ে আসবে একদিন—।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিম দিগন্তে যেখানে আকাশ মিশেছে সেদিকটা লালে লাল। আমরা সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। সারা পথ রত্নাদি আমার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। এলা তখনও কোনো কথা বলছে না, মনে হয় যেন আমাদের কথা শুনছেও না। মেয়েটা লাজুক না অহংকারী?

রত্নাদিদের বাড়িটা বেশ দূরে। একটা বড় মাঠ পেরিয়ে খুব ফাঁকা জায়গায়। স্টেশন থেকে যত দূরে হয়, ততই বাড়ি ভাড়া কমে যায়।

সেদিন আর রত্নাদিদের বাড়ির মধ্যে যাইনি, রত্নাদিও ডাকেননি ভেতরে। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রত্নাদি বলেছিলেন, মাঝে মাঝে চলে এসো নীলু! আমরা প্রায় সব সময়েই বাড়িতে থাকি। আর হ্যাঁ, শোনো, একটা কথা মনে পড়েছে। তুমি কি ট্রেনে চেপে ঝাড়গ্রাম যেতে পারবে?

আমি বললুম, আমি তো প্রায়ই যাই।

—একটা ওষুধ আনতে হবে, এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি এনে দিতে পারবে?

আমি অহংকারে বানিয়ে বললুম, আমি তো কালকেই ঝাড়গ্রামে যাবো বাজার করে আনতে।

—তা হলে তো ভালোই হলো।

সেদিন ওখান থেকে ফেরার পথে আমি বেশ ভয় পেয়েছিলুম মনে আছে।

অথচ ভয় পাবার কোনো কারণ ছিল না, আমি তেমন একটা ভীতুও নই।

এবড়ো খেবড়ো পাথর ছড়ানো বড় মাঠটা পেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ কালবোশেখির ঝড় উঠেছিল। চতুর্দিক শোঁ শোঁ শব্দে কেঁপে উঠলো। ঘূর্ণিপাক খেয়ে উড়তে লাগলো ধুলো, কোনো দিকে কিছুই দেখা যায় না। আমার মনে হলো, এখন ছুটতে গেলেই আমি দিক ভুল করবো।

মাঠের মধ্যে ঝড় দেখে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। কিন্তু, তার একটু আগেই, বড়দিদের বাড়ির গেট পেরুবার একটু পরেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে এবারে একটা পরিবর্তন আসছে। আমি সাবালকদের জগতে প্রবেশ করেছি, এবার শিগগিরই এমন কিছু ঘটবে যার ফলে বদলে যাবে আমার বাকি জীবনের গতি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে খানিক দূর আসার পরই অকস্মাৎ এরকম ঝড় ওঠায় আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। এই যে অন্ধ ঝড়, যার মধ্যে কোনো দিক বোঝা যায় না, এই কি তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক ?

যাই হোক, সেই সন্ধেবেলা ঠিকঠাকই বাড়ি পৌঁছেছিলুম।

বড়দি যদি ঝাড়গ্রাম থেকে আমাকে ওষুধ আনবার কথা না বলতেন, তাহলে হয়তো পরের দিনই আমার ও বাড়িতে যাওয়া হতো না। যদিও আমার তখন মন চাইছিল মানুষের সঙ্গ, কিন্তু বড়দিদের বাড়িতে যাবো কি যাবো না তা ভেবে ভেবে মন ঠিক করতে আমার দু'তিন দিন লেগে যেত।

ওষুধ নিয়ে পৌঁছোবার পর সেদিন দেখলুম শৈলেনদাকে। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতিতে শৈলেনদাকে মনে ছিল একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ হিসেবে। এখন দেখলুম বিছানার সঙ্গে একেবারে লেগে যাওয়া একজন কঙ্কালসার মানুষ। একটানা দু'তিন মিনিট কথা বলতে পারেন না, তারপরই দারুণ হাঁপানি ওঠে।

তবু আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি অন্য কারণে। শৈলেনদা একবারও তাঁর অসুখের কথা বলেন না। মুখে ব্যথা-বেদনার কোনো চিহ্ন নেই। অত হাঁপানির মধ্যেও একটু সুযোগ পেলেই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, নিজেও হেসে ওঠেন। এরা অন্য ধরনের মানুষ।

বড়দি আমার পরিচয় দেবার পর শৈলেনদা বললেন, ও হাঁ, মনে আছে... তোমার বাবা তো ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, সেই সকালে বেরুতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, দাদা, আপনি আপনার ছেলেদের কারুকে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবেন ? হা-হা-হা!

সেদিন বড়দি আমায় বলেছিলেন, নীলু, তুমি কি রোজ বাজার যাও ? তাহলে আমাদের কিছু আলু আর পেঁয়াজ এনে দেবে ? অনেকটা দূর তো, তাই আমরা রোজ বাজারে যাই না। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না হয়...

কয়েকদিন পরে বোঝা গেল, আমি যে শুধু আমাদের বাড়িরই ফেত অঙ দা ফারাসিসি ভাই-ই নয়, বড়দিরাও অনেক ব্যাপারে আমার ওপরে নির্ভর করেন। উনিশ বছর বয়েসে দুটি সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর। সকাল-বিকেল দু'বেলাই আমাকে বড়দিদের বাড়িতে যেতে হয়। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারের একটা সাইকেল ছিল, আমি ব্যবহার করতে লাগলুম সেটা, ফলে অনেক সুবিধে হয়ে গেল।

অনেক গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, মধুপুর বা শিমুলতলার মতন জায়গায় বেড়াতে গেলে উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রেমের ব্যাপার হয়ে যায়, সেটা খানিকটা মধুর বিরহে শেষ হয়। কিন্তু এলার সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। এলা প্রায় আমারই বয়েসী, কলেজে সে আমার চেয়ে এক ইয়ার নিচে পড়ে, আমাদের মধ্যে প্রেম না হোক বেশ একটা বন্ধুত্ব হওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। আমার দিক থেকে ইচ্ছেও ছিল যথেষ্ট। তবু সে রকম কিছু হয়ে উঠলো না।

এলা সত্যিই বড় কম কথা বলে। ওদের বাড়িতে যখনই যেতুম, দেখতুম সে কোনো বই নিয়ে বসে আছে। রান্না ঘরে তাকে রান্না করতে, কুয়ো থেকে জল তুলতেও তাকে দেখেছি। কিন্তু তার বই হাতে নিয়ে বসে থাকা ছবিটিই বেশি মনে পড়ে।

এলা যে আমার সঙ্গে একেবারে কথা বলতো না তা নয়। চা খাবেন ? বা, আপনাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে ? এই ধরনের মামুলি কথা সে বলতো ঠিকই, কিন্তু তার মনটাকে সে যেন রেখেছিল একটা খড়ির গণ্ডি দিয়ে ঘিরে, যার মধ্যে সে কারুকে প্রবেশ করতে দেবে না। অনেক সময় কোনো কথা না বলে সে শুধু আমার চোখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো, সেটাই আমার অদ্ভুত লাগতো। মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকায় না।

পরের শনিবার কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হলো অজিতদা আর সুকোমলদা। এদের মধ্যে অজিতদা হলো বড়দির ছোটভাই আর সুকোমলদা তার বন্ধু। শৈলেনদার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই, বড়দির বাড়ির লোকরাই মাঝে মাঝে এদের দেখাশুনো করতে আসে। পনেরো দিন অন্তর একবার। শনিবার বিকেলে এসে সোমবার চলে যায়।

যদিও ওরা আসে অসুস্থ শৈলেনদার খোঁজ-খবর নিতে, কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে একটা বাইরে বেড়াতে আসার মেজাজ থাকে। বাড়িটা হৈ-হল্লায় সরগরম হয়ে ওঠে। বাগানে মুর্গী কাটা হয়। সন্ধের পর সুকোমলদার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে রামের বোতল। এমনকি শৈলেনদাকেও সেই রাম খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল,

দু' চুমুক দিয়েই শৈলেনদা দারুণ কাশতে শুরু করেছিলেন।

সুকোমলদা সদ্য ডাক্তারি পাশ করে হাউস সার্জেন হয়েছে তখন, এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে এসে তার চালচলন বিরাট ডাক্তারের মতন। শৈলেনদার বুক পিঠ পরীক্ষা করে গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, শুনুন, জামাইবাবু, আমি যা বলছি, তা যদি ঠিকঠাক মেনে চলেন, তা হলে দু' সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে খাড়া করে দেবো!

শৈলেনদা হেসে বলেছিলেন, ওরে, অনেক টাকা খরচ করে অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। আমি কি ছেলেমানুষ যে আমাকে মিথ্যে স্তোক বাক্য দিয়ে ভোলাবি? এখানে এসেছিস, একটু আনন্দ ফূর্তি কর। কাল তোরা সবাই মিলে টিলাটিলে ঘুরে আয় না!

প্রথম দিন গালুডিতে পৌঁছোবার এক ঘণ্টা বাদেই আমি দেখেছিলুম, সুকোমলদা এলাকে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি না হয় খুব লাজুক, কিন্তু সুকোমলদা তো গল্পের বইয়ের চরিত্রের মতন, স্বাস্থ্য ভালো, ডাক্তারি পাশ করেছে, পরিপূর্ণ সার্থক একজন যুবক। সে এলার মতন একজন যুবতী মেয়েকে দেখলে প্রেম না হোক একটু খুনসুটি তো করতে চাইবেই। আমার সামনেই সুকোমলদা এলার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো, এই মেয়েটা এত লাজুক কেন? কথাই বলে না!

সেদিন আমি ও বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকিনি।

পরের দিনও সকালে ও বাড়িতে যাইনি অন্যদিনের মতন। বাজার-টাজার করবার জন্য আর তো আমার প্রয়োজন হবে না, দুজন শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষই তো এসে গেছে।

বিকেলবেলা অজিতদা আর সুকোমলদা পিকলু আর এলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। মার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলো। তারপর সুকোমলদা আমাকে বললো, নীলু, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমরা একটু বেড়াবো—।

এ কথা ঠিক, সুকোমলদা কখনো আমার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি। আমাকে সে প্রতিযোগী হিসেবে ভাবেনি মোটেই। সে কথা সে ভাববেই বা কেন, আমি তো এলার যোগ্য ছিলাম না, এমনকি বন্ধুও হতে পারিনি। নীচু রাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় সুকোমলদা এলার কাঁধ জড়িয়ে ধরতো, আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করতো না। বোধহয় আমাকে মনে করতো ছেলেমানুষ।

এলা কিন্তু সুকোমলদাকে দেখে গদ্গদ হয়ে যায়নি। স্বভাব পাল্টায়নি সে। সুকোমলদার মতন একজন আকর্ষণীয় ও উৎসাহী যুবককে দেখেও প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠেনি সে। সুকোমলদা তার কাঁধ জড়িয়ে ধরলে সে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। রেগে চ্যাঁচামেচিও করেনি, আবার প্রশ্রয়ও দেয়নি।

গালুডিতে আমাদের থাকার কথা ছিল কুড়ি একুশ দিন। আমার ছোট ভাই-বোনেরা দশ-বারো দিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ঐ বয়সে প্রকৃতি বেশি ভালো লাগে না। বড় উদ্ভুত স্বভাবেই ওরা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। রোজই বায়না ধরতো, মা, আর ভালো লাগছে না। এবারে ফিরে চলো!

মা বলতেন, এত খরচ-পত্তর করে আসা, এর মধ্যেই ফিরে যাবি কী রে! দাঁড়া, আগে তোদের বাবা আসুক। এখানকার জল খুব ভালো—।

বাবা আসবেন আসবেন করেও আসতে পারছিলেন না। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, থাকো, আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও!

এক সপ্তাহকাল ঘুরে যাবার পর অজিতদা আর সুকোমলদা আবার এলো কলকাতা থেকে। এবার সঙ্গে আর একজন বন্ধু, তার নাম সৌমিত্র। সে খুব ভালো গান করে। শনিবার সন্ধেবেলা বসলো গানের আসর। পরের রবিবার পূর্ণিমা, ঠিক হলো, সেদিন বাগানে চাঁদের আলোয় পিকনিক হবে! সুকোমলদা আমাকে বললো, নীলু, তুমি বাড়িতে বলে আসবে, কাল রাতে তোমার ফেরা হবে না। বেশি রাত হয়ে যাবে, তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে। কিংবা আমরা সারা রাতই জাগতে পারি!

মা অবশ্য আমার বাইরে রাত কাটানোর প্রস্তাবে রাজি হননি। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, ডাকাতির ভয় আছে, আমাদের বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ তো নেই। মা বলেছিলেন, এগারোটার মধ্যে ফিরে আসিস।

বড়দিও রাত্তিরবেলা বাগানে পিকনিক করার ব্যাপারটা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। সন্ধের দিকে তিনি বলেছিলেন, অজিত, তোরা বরং সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যা না! জানিস তো, তোর জামাইবাবু এইসব হৈ-চৈ কত ভালবাসতো! এখন নিজে জয়েন করতে পারে না। ঘরে শুয়ে শুয়ে সব আওয়াজ শুনবে, ওর খারাপ লাগবে।

এ কথা শুনে সুকোমলদা সহাস্যে বলেছিল, তুমি বলছো কী, মেজদি! এই ব্যাপারটা আমরা ভাবিনি? জামাইবাবুর অসুখটা তো বেশির ভাগই সাইকোলজিক্যাল। আজ ওকেও আমরা পিকনিকে নিয়ে জমাবো। বাগানে খাটে শুয়ে থাকবে।

শৈলেনদা সব শুনে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ আমি বেশ ভালো আছি। কতদিন খোলা আকাশের নিচে শুয়ে চাঁদের আলো দেখিনি। আমি যাবো—

কেন যেন সেই পিকনিকে আমি খুব আনন্দ পাইনি। শৈলেনদা বারবার কাশছিলেন। সুকোমলদা আর সৌমিত্রদা রামের বোতল আর গান নিয়ে নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে রইলো। একবার তারা এলাকে খুব পীড়াপিড়ি করতে লাগলো গান গাইবার জন্য। এলা কিছুতেই গান গাইবে না। ওরা এলার হাত ধরে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দিল ঘাসের ওপর। এলা মুখ গোঁজ করে রইলো তবু। আমার মনে হলো, কয়েকজন অত্যাচারী পুরুষ এলাকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আমি কি করবো। আমি তো এলার প্রেমিকও নই, বন্ধুও নই।

রাত সাড়ে দশটার সময় আমি উঠে পড়লুম। অন্য কারুর কাছে বিদায় নেবার কোনো দরকার নেই, আমি শুধু বউদিকে বললুম, আমি যাচ্ছি বউদি, মা চিন্তা করবেন। বউদি একটুও আপত্তি করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, যাও। তোমার কাছে টর্চ আছে তো নীলু?

গেটের কাছে এসে দেখি সেখানে এলা দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছিল কী? কী জানি, আমি তার চোখ দেখিনি। জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কোনো মেয়ের মুখের ওপর টর্চও ফেলা যায় না।

আমাকে দারুণ চমকে দিয়ে এলা বললো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমি শুকনো গলায় বললুম, আমার... আমার সঙ্গে?

হাঁ।

—বলো!

আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুটি মেলে এলা চুপ করে রইলো। অন্ধকারের মধ্যেও যেন আমি দেখতে পেলুম তার কালো চোখের [illegible]। এই রকম ভাবে পল, অনুপল ধরে হতে হতে কত সময় কেটে গেল কে জানে!

একসময়ে অজিতদা এলো, এলা, তোকে সুকোমল ডাকছে, এই বলে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমরা দু'জনেই মুখ ফেরালুম সেদিকে। অজিতদা নিরীহ, ভালোমানুষ ধরনের, তার বন্ধুরা কিসে খুশী হয় তাই দেখার জন্যই সব সময় সন্ত্রস্ত।

এলা আমাকে বললো, আজ থাক। তুমি কাল আসবে? [illegible] ওরা চলে গেলে, তারপর বলবো। ঠিক এসো—।

সে রাতে কি আমি ঘুমোতে পেরেছিলুম একটুও? শুধু বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি। চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠেছে গেটের কাছের সেই দৃশ্যটা। এলা কি ওখানে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল? এতদিন বাদে সে একসঙ্গে অতগুলো কথা বলেছিল, যেন সেই মুহূর্তে সে খণ্ডিত গণ্ডিটা মুছে দিয়ে কাছে ডেকেছিল আমাকে।

আসলে রাত্তিরে বিছানায় শুলে সকলেই কোনো এক সময় ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। আমার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সকাল আটটা বেজে গেছে। মা আমায় ডেকে তুলে বললেন, চা খাবি না? আজ আর বাজারে যেতে হবে না।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

বছরের প্রথম বৃষ্টি, বাইরের দিকে তাকালে আরামের আমেজ লাগে। অন্যান্য দিন সকাল ন'টার মধ্যেই চড়চড়ে রোদে একেবারে ঝলসে যেত চারদিক। আজ সজল স্নিগ্ধ রঙে ছেয়ে আছে পৃথিবী। গাছপালাগুলো আর রুক্ষ মাটি হ্যাংলার মতন চোঁ চোঁ করে টেনে নিচ্ছে বৃষ্টির পানীয়।

আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি বটে কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সব সময় বেজে চলেছে একটা রাগিণী। এলা আমাকে কিছু বলবে! এলা আমাকে কিছু বলবে।

কী বলবে এলা? এমন কোনো কথা, যা অজিতদার সামনে বলা যায় না! অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায়? আমি কি এতখানি যোগ্য! এর আগে তো সে একবারও অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলেনি আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝে শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকেছে, আমি কি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারিনি?

বৃষ্টি থামলো সাড়ে ন'টার পর। এখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। মনটা যদিও ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করাই ঠিক করলুম। দশটার পর অজিতদারা বেরিয়ে ট্রেন ধরতে যাবে। এখন গোছগাছ চলছে, এই সময় গিয়ে পড়লে কোনো কথাই হবে না। তাছাড়া সুকোমলদা হয়তো আমাকে স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। আগেরবার তাই করেছিল। থাক আর একটু দেরি করে যাওয়াই ভালো, অজিতদারা বেরিয়ে পড়ুক বাড়ি থেকে। এলাও সেই কথাই বলেছিল, ওরা চলে গেলে —

আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই ট্রেন লাইন গেছে, কখন কোন ট্রেন যায় আসে আমরা আওয়াজ শুনতে পাই। কলকাতার ট্রেনের জন্য কান খাড়া করে রইলুম।

তার মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো ঝেঁপে। এবারে আরও বড় বড় ফোঁটা, আর এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে, তার সঙ্গে ঢেউ-এর মতন আসছে বৃষ্টি। এরই মধ্যে ঝমঝমিয়ে চলে এলো কলকাতার ট্রেন। বাড়িতে আমার রেইনকোট নেই, কিন্তু একদিন বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু আসে যায় না।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বললুম, মা, আমি একটু বেরুচ্ছি।

মা বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে? কোথায় যাবি? বললুম যে আজ বাজারে যাওয়ার দরকার নেই। ডিমের ঝোল করে দেবো।

— একটু রত্নাদিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো।

— এই বৃষ্টি মাথায় করে? কালই তো মাঝরাত্তির পর্যন্ত সেখানে ছিলি! আজ সকালেই আবার যেতে হবে কেন?

আমি চুপ করে রইলুম। কাল অত রাত করে ফেরার পর আজ সকালেই আবার ছুটে যাওয়ার কী যুক্তি আমি দেখাবো?

আমি এখন হেড অফ দা ফ্যামিলি। যখন যেখানে খুশি যেতে পারি। এর আগে মায়ের কাছে কোনো যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন রত্নাদিদের বাড়ির কথা একবার বলে ফেলে একটা দারুণ লজ্জা আমায় ছেয়ে ফেললো। কেন সেখানে যেতে চাই তা মাকে বলা যাবে না।

চুপ করে বসে রইলুম বারান্দায়। কিন্তু বৃষ্টির রূপ দেখার মন আমার নেই। এই বৃষ্টি আমার অসহ্য লাগছে। আগে কোনোদিন আমার বৃষ্টির ওপর এত রাগ হয়নি।

অজিতদাদের ট্রেন ধরতে হবে, তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি। এতক্ষণে বাড়ি ফাঁকা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রত্নাদি রয়েছেন রান্না ঘরে, শিবুদা বারান্দায় খেলছে, আর এলা একটা বই সামনে নিয়ে বসে আছে। নিশ্চয়ই সে বারবার চোখ তুলে দেখছে গেটের দিকে। সামান্য বৃষ্টির জন্য আমি তার কাছে যাইনি। নিশ্চয়ই সে আমাকে কাপুরুষ ভাবছে।

এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে কিছু না বলে ছুটে চলে যাই। কিন্তু বৃষ্টি আর হাওয়ার বেগ ছুটোছি বেড়েছে। এর মধ্যে বিনা কাজে বেড়ানো খুবই অস্বাভাবিক। আমি তো সেরকম গোঁয়ার বা অবাধ্য ধরনের ছেলে ছিলাম না।

সেই বৃষ্টি থামলো প্রায় পৌনে একটায়। মা তখনই আমাকে খেতে ডাকলেন। এই সময়ে কারুর বাড়িতে যাওয়াও ঠিক নয়। বারোটা থেকে তিনটে, এই সময় অযাচিতভাবে কেউ কারুর বাড়ি যায় না, এরকম একটা অলিখিত নিয়ম আছে। ও বাড়িতে গেলে রত্নাদিই হয়তো আমাকে প্রথম দেখবেন, একটু অবাক হয়ে তাকাবেন। কিংবা, দুপুরবেলা ও বাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে, আমি দরজা ধাক্কা দিলে ঘুম থেকে উঠে এসে রত্নাদি জিজ্ঞেস করবেন, কী ব্যাপার?

আড়াইটের সময় আবার বৃষ্টি ফিরে এলো। এবারে বেশ হাল্কা, ঝিরঝিরে। কে বলবে গত কাল দুপুরেই এ অঞ্চলে কী প্রচণ্ড গরম ছিল, এখন বেশ ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব।

জানলার পাশে এসে আমাদের কেয়ার-টেকার লটপট সিং জানালো, এরকম সারাদিন ধরে বৃষ্টি এ অঞ্চলে সাধারণত হয় না। এ যেন বঙ্গাল বারিষ-এর মতন!

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, বৃষ্টি থামুক বা না থামুক, ঝড়-বজ্রপাত যা কিছু শুরু হোক, তিনটে বাজলেই আমি বেরিয়ে পড়বো।

মা আমি যাচ্ছি! বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি চলে এলুম গেটের বাইরে। বৃষ্টি থামেনি। জোরও হয়নি। সাইকেলটা নেবার কথা মনে পড়েনি। আমাদের বাড়ির রাস্তাটুকু ছাড়াবার পরেই আমি দৌড় শুরু করে দিলুম। অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এলা আমাকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে কথা আছে। এখনো নিশ্চয়ই সে আমার অপেক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে।

রত্নাদিদের বাড়ির কাছে এসে দেখলুম গেটটা হাট করে খোলা। ভেতরের দরজাগুলোও খোলা। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কী যেন একটা কিছু হয়েছে। তারপর লক্ষ করলুম বাগানের মধ্যে একটা ট্রাক দাঁড় করানো।

আমি গেটের কাছে এসে পৌঁছতেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো অজিতদা। একি, অজিতদা যাবনি সকালের ট্রেনে! কেন?

অজিতদা আমাকে দেখে বললো, তুমি এসে পড়েছো? তোমাদের বাড়িতে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলুম।

একটু থেমে, মাটির দিকে চোখ রেখে, নিচু গলায় বললে, সাড়ে দশটার সময় শৈলেনদা মারা গেছেন।

আমার উনিশ বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় শোক অনুভব করেছিলুম সেই মুহূর্তে। শৈলেনদার জন্য নয়। এটা মৃত্যুর বাড়ি, এখানে অন্য কোনো কথা হবে না। এলা আমাকে তার সেই কথাটা বলতে পারবে না।

সাড়ে দশটার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে, কান্নাকাটির পালাও চুকে গেছে। এখন সবাই নানা রকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। রত্নাদিকে অন্যদিনের মতনই শক্ত দেখলুম। তিনি জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছেন। সন্ধের আগেই ওরা ট্রাকে করে সবাই মিলে রওনা হবেন কলকাতার দিকে। কী একটা ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে শৈলেনদার দেহ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পোড়ালেই সুবিধে হবে।

আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এলুম এ বাড়িতে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বাগানে। আমার আর কিছুই করার নেই। এলার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। তার দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। তাতে কি ভর্ৎসনা ছিল? কিংবা, এলা কাল রাতের কথা ভুলে গেছে? আমাকে সে আর কিছু বলতে চায় না?

ওদের ট্রাক গালুডি ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথম জল এলো আমার চোখে। আমার হাতায় বারবার চোখ মুছি তবুও কান্না থামে না।

তারপর আর কোনোদিন এলাকে দেখিনি। স্বস্তাদি কোথায় থাকেন জানি না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা ওরা বোধ করেননি। সেইটাই তো স্বাভাবিক।

আমার জীবনে সেই প্রথম একটি নারী আমাকে বলেছিল, আমাকে সে নিরালায় কিছু জানাতে চায়। কী বলতে চেয়েছিল এলা? আমি কিছুতেই তা অনুমান করতে পারি না আজও। হয়তো খুবই সাধারণ কোনো কথা। বোধহয় কোনো বই চাইতো। কিন্তু অজিতাকে দেখে থেমে গিয়েছিল কেন?

সেই কথাটা শোনা হয়নি, এলাকে আর কখনো দেখিনি, তাই আজও আমার জীবনে একটা শূন্যতা বোধ রয়ে গেছে। বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে, শূন্যতা-বোধটা আরও বেড়ে যায়, জানা হয়নি একজন নারীকে, সে কিছু বলতে চেয়েছিল, আমার শোনা হয়নি।

চূড়ামণি উপাখ্যান

ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা আসে, শেষ রাত্তিরের দিকে। কোথা থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না।

ঘোড়াগুলো ছোট হলেও দারুণ তেজী, চৈত্র মাসের ঝড়ের মতন হঠাৎ শোনা যায় তাদের আগমন-শব্দ। কিছুই সামাল দেবার সময় পাওয়া যায় না, আবার উধাও হয়ে যায় চোখের নিমেষে।

সংখ্যায় তারা জনা ছয়েকের বেশি নয়, যদিও বাড়ি ঘেরাও করার পর তারা এমন ভাবে ছোটাছুটি করে যেন সব দিকেই কেউ না কেউ আছে, এক একজনকেই মনে হয় অনেকজন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘোড়াগুলো গুনেছে।

এমন নয় যে তারা শুধু অমাবস্যার রাতে মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। গত কোজাগরী পূর্ণিমায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যেও তারা এসেছিল। সেদিন পীতাম্বর গড়াই-এর বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো। সারাদিন হুলুস্থুল ধুমধাম, সন্ধেবেলা কীর্তন গানের আসর বসেছিল, বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্বরা পাত পেড়ে খেয়েছে, সবাই বাড়ি ফেরেনি, থেকেও গেছে কয়েকজন। সব কাজ কর্ম মিটিয়ে হুড়াহুড় শোয়াতে শোয়াতে রাত প্রায় একটা। ওরা এলো তার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে।

শেষ রাতের ঘুম খুব গাঢ় হয়। চোখ মেললেও সহজে চৈতন্য আসে না। কী হয়েছে বুঝতে না বুঝতেই সব শেষ। উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল মোংলা, সে নাকি প্রথম থেকে সব দেখেছে। এবারে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে আগে আগেই, একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়েছিল মোংলা, কপা কপ্‌, কপা কপ্‌, ঘোড়ার

পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙলেও সে ভেবেছিল বুঝি ঘুমিয়েই শরীফের ঘোড়দৌড়ের স্বপ্ন দেখছে। তারপর সেই আওয়াজ একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। কিন্তু খাটিয়া থেকে নামবারও সময় পেল না, একটা বিকট কালো মূর্তি দাঁড়ালো তার বুকের ওপর এক পা চাপিয়ে। সেই পা জগদ্দল পাথরের মতন ভারি, তার ওপর মোংলার নাকের ডগার কাছে তরোয়াল।

মোংলার বর্ণনা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তার কপালে রয়েছে তরোয়ালের খোঁচার ঘা, ডাকাতরা যাবার সময় তার এক চোখের ওপর চাবুক মেরে গিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর বাঁ চোখটা খুলতে পারে না। তবু সেই অবস্থার মধ্যেই মোংলা অনেক কিছু দেখেছিল। পীতাম্বর গড়াইয়ের বাড়ি মেটে বাড়ি হলেও ছ'মহলা। ডাকাতরা সে বাড়ির অন্ধিসন্ধি সব আগে থেকেই জানে। তারা অন্য কোনো ঘরে খোঁজাখুঁজি করেনি, তাদের মধ্যে দু'জন সোজা পীতাম্বরের ঘরের সামনে গিয়ে দুই লাথিতে দরজা ভেঙেছে। পীতাম্বরের চুলের মুঠি ধরে খাট থেকে নামিয়ে তাকে শেষ করেছে এক কোপে, তারপর এক ঝটকায় বিছানা থেকে তোশকটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো, পীতাম্বরের সব টাকা ঐ তোশকের মধ্যে সেলাই করা।

পীতাম্বরের ঘরে যখন এই সব কাণ্ড চলছিল, তার মধ্যেই মোংলা শুনতে পাচ্ছিল জল ছেটানোর শব্দ। কেউ যেন সারা বাড়িতে গোবর ছড়া দিচ্ছে। আসলে জলও নয়, গোবর ছড়াও নয়, ডাকাতদের একজন কেরোসিন ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। চটপট কাজ হাসিল হতেই আগুন লাগিয়ে দিল, গোটা বাড়ি জ্বলে উঠলো এক সঙ্গে।

এই রকমই করে ওরা, যাবার সময় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাই কেউ আর ওদের পিছু ধাওয়া করতে পারে না। সবাই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

কেমন চেহারা ঐ ডাকাতদের? মোংলার বর্ণনায় তাদের সকলেরই কুচকুচে কালো পোশাক, মুখও কালো কাপড়ে ঢাকা, তাই তাদের সবাইকে এক রকম দেখায়। তাদের বয়েস বোঝা যায় না। মোংলার মতে তারা 'শয়তানের জীব'। অনেকে এটা বিশ্বাস করে। কারণ, ধলাসেখালির রতুবাবু ঐ ডাকাতদের দিকে বন্দুক চালিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, রতুবাবুর বন্দুকের জোর আছে, তিনি একবার একটা বাঘ মেরেছিলেন, ধান লুটের সময় দুটি মানুষও মেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর গুলিতে ঐ ডাকাতদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি, তাদের ঘোড়াগুলোও জখম হয়নি। এক পক্ষকাল পরে তারা ফিরে এসে রতুবাবুর বাড়ি জ্বালিয়ে তাঁর গলা কেটে দিয়ে গেছে।

ওরা যে শুধু ধনবান লোকদের বাড়িতেই টাকা লুট করতে আসে তাও নয়। হারুণ শেখ মানুষটা তেজী, কিন্তু তার ধন সম্পদ তো বিশেষ ছিল না। সেই হারুণ শেখের বাড়িতেও এক রাত্রে ডাকাত পড়লো। ঘোড় সওয়াররা হারুণ শেখকে শুধু খুন করেনি, তার হৃৎপিণ্ডটাই নাকি উপড়ে নিয়ে গেছে। এমন হৃৎপিণ্ড ওপড়াবার ঘটনা আরও শোনা যায়। আবার কোনো কোনো বাড়িতে আসে ওরা যুবতী মেয়ে লুঠ করবার জন্য। জীবন নায়েকের বাড়িতে পাঁচ ভরি সোনা ছিল। সে খবর ডাকাতরা পায়নি, সে বাড়ি থেকে জীবন নায়েকের সোমত্ত, সুন্দরী বউটাকে শুধু তুলে নিয়েছে, অবশ্য সে বাড়িতেও আগুন জ্বালিয়ে দিতে ভুল করেনি।

অশ্বারোহী ডাকাতদের দাপটে গোটা তল্লাটটার মানুষজনের রোম খাড়া হয়ে আছে। হাট-বাজারে, ঘাটে এই ডাকাতদের কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই। গুজব উঠছে নানারকম। তবে আসল ঘটনাই এমন নৃশংস যে তার ওপর বেশি রং চড়াবার মতন কল্পনাশক্তি এদিককার মানুষদের নেই। রাত্তিরবেলা দূরে কোনো গ্রামে আগুন জ্বলে উঠলেই বোঝা যায়, এই যায়, ডাকাতরা টগবগিয়ে চলে গেল। কোথায় যায় ওরা? এই প্রশ্নের কোনো হদিশ নেই বলেই অলৌকিক কথা মনে আসে। 'শয়তানের জীব', ওরা ঘোড়া সুদ্ধ ডুব দেয় গাঙের জলে।

এই নদী-নালার দেশেও ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি, ঘোড়া কোথায় এদেশে? বড় বড় নৌকোয় যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করতে আসে, তারা এই প্রশ্ন করে।

দিনের বেলা ফুরফুর করে বয় সোনা বাতাস, পাতলা রোদ্দুরে দুলে দুলে উড়ে যায় বগেরি পাখির ঝাঁক, মাছ ধরা ডিঙিগুলো রুপোলি জলে হাঁসের মতন ভাসে। রাত্তিরের ঐ বিভীষিকা তখন মনে হয় অলীক।

হ্যাঁ, এই জল-কাদার দেশেও ঘোড়া আছে। এখানে জঙ্গলে আছে বাঘ, জলে আছে কামোট-কুমীর। কিন্তু ঘোড়া এমনই তেজী প্রাণী যে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়, কুমীর কামোট তাকে ছুঁতে পারে না। জঙ্গলের বাঘ নাগাল পাবার আগেই ঘোড়া জঙ্গলের পথ কাবার করে দেয়। তাই শৌখিন লোকেরা কেউ কেউ ঘোড়া রাখে। কখনোসখনো ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যান। তা ছাড়া ছুটিবারে শরীফে ঘোড়দৌড় হয়। ইস্কুল ডাঙার মাঠে সত্যিকারের ঘোড়দৌড়, প্রতি হাটবারে, দশ-টাকা বিশ-টাকার বাজি রেখে ঘোড়দৌড়। সাত আটটা ঘোড়া দৌড়োয়, বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ঐ ঘোড়দৌড়ের ছেলেগুলিই বুঝি ডাকাতি শুরু করেছে। কিন্তু এই ছোঁড়াগুলো যে বড়ই বাচ্চা। এদিককার ঘোড়াও

বেশ ছোট, প্রায় গাধার সঙ্গে উনিশ বিশ, বয়স্ক মানুষদেরও বহন করতে পারে বটে কিন্তু তাহলেও জোটার সময় গতি থাকে না। তাই ঘোড় দৌড়ের সওয়াররা সবাই পাতলা চেহারার কিশোর। যে ছোকরাটি প্রায় প্রতিবারই ফার্স্ট হয়, সেই কামরুল তো অন্যান্য দিন কাজ করে পাম্বারের মুদিখানায়। রোগা ডিগডিগে শরীর, মুণ্ডুটা বড়, মনে হয় এক চড় মারলে ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু ঐ কামরুলই যখন ঘোড়া ছোটায়, কী তার তেজ, মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে যায়, বাতাসের বেগকেও যেন সে জয় করে নিতে পারে, চাবুক মারতে মারতে এক এক সময় সে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে। কামরুলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম বলরাম, কালু মিস্তিরির ছেলে, তার বাবা গায়ে পাঁচড়া হলে কী হয়, গলার জোরেই সে তার ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে ছোটায়।

এই কামরুল, বলরাম, আনিসুল এরা কী ডাকাত হতে পারে?

অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, আজকাল ছুঁড়ো গাঁড়াদেরও বিশ্বাস নেই। দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন মায়ের পেট থেকে পড়তে না পড়তেই এরা বুলি শেখে। দশ এগারো বছর বয়েস হতে না হতেই টাকা পয়সা চিনে যায় খুব, মুখে শোভা পায় জলন্ত বিড়ি। কপালে চুল গজাবার আগেই এরা মেয়েলোকদের দিকে নজর দিতে শুরু করে। চোদ্দ বছর বয়েসেই এক একজন নায়েক।

এদের চেহারা ডাকাতসুলভ না হলেও এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সন্দেহের কারণ এদের অশ্বশক্তি। এমন জোরে ঘোড়া ছোটাতে তো আর কেউ পারে না এ তল্লাটে। ইস্কুল মাস্টার মধু নস্কর জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে থানা পুলিশের কাছে আর্জি জানালেন এই ছোকরাগুলোর বিরুদ্ধে। জুয়াড়ির শখের ঘোড় দৌড়ে প্রতি হাটবারে অনেক চাষী তাদের রক্তজল করা পরিশ্রমের টাকা জলাঞ্জলি দেয়। লাভের টাকা যায় ঘোড়ার মালিকদের ঘরে। যে ছোকরাগুলো ঘোড়া ছোটায় তারা পায় মাত্র দশ টাকা করে, তবু ঐ ছোকরাগুলোর ওপরেই মধু নস্করের রাগ বেশি।

এক হাটবারে পুলিশ এসে ঘোড় দৌড় মাঝপথে থামিয়ে কামরুল, বলরাম, কাদের একরুন্তি, আনিসুল সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। যারা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলতে এসেছে, তারা অসন্তুষ্ট হলো খুব, ডাকাতির কথা তাদের তখন মনে নেই।

যেন মধু নস্কর আর তার জনসাধারণকে উপহাস করার জন্য সেই রাত্রেই ডাকাত পড়লো মধু নস্করের কাকা যাদব নস্করের বাড়িতে। গভীর রাতে সেই রকমই ঘোড়া ছুটিয়ে এলো ছ'জন ডাকাত, যাদব নস্করের ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে, দু'জনকে খুন করে একেবারে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল। যাদব নস্করের সঙ্গে স্ত্রীরা শাপ-শাপান্ত করতে লাগলো মধু নস্করকে।

এই অঞ্চলে থানা পুলিশের ওপর মানুষের ভরসা নেই। খুন-জখম, ডাকাতি লেগেই আছে। পুলিশকে খবর দিলেও সাড়া পায় না। যদি বা কখনো পুলিশ আসে, এসে আস্তানা গাড়ে গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতে, পেট ভরে খাওয়া দাওয়ার পর দারোগা সাহেব হাই তুলতে থাকেন। লোকজনের অভিযোগ শুনতে শুনতে তাঁর চোখ টেনে আসে ঘুমে।

কেউ কেউ বলে, ঐ পুলিশও যা, ডাকাতও তা। রূপকথার গল্পে যেমন থাকে, দিনের বেলা যে পাটরাণী, রাত্রিবেলা সে-ই রাক্ষসী। সেইরকম দিনের বেলায় যারা পুলিশ, রাত্তিরে তারাই ডাকাত। যে রক্ষক সেই ভক্ষক বলে কথা আছে না?

তেঁতুলছড়ি গ্রামে এখনো ডাকাত পড়েনি। আশ-পাশের কোনো গ্রামই প্রায় বাদ যায়নি, সবাই ভাবে এবারে তেঁতুলছড়ির পালা। কবে আসবে, কবে আসবে এই ত্রাস। এই গ্রামের মানুষ রাতের পর রাত জেগে কাটায়, যদিও জানে, রাত জেগে পাহারা দিয়েও লাভ নেই, ঐ ডাকাতদের রোখার সাধ্য নেই তাদের। এক বাড়িতে ডাকাত পড়লে অন্য বাড়ির কেউ ছুটে আসবে না, সাধ করে কে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাইবে।

তেঁতুলছড়িতে অবশ্য সে-রকম ধনবান কেউ নেই, প্রায় সবাই চাষাভুষো আর কয়েকঘর জেলে-তাঁতী। রতনমণি ঘোষের বাবা গোয়ালা ছিল, এখন এরা নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, এদেরই জমি-জমা কিছু বেশি, আবার ও বাড়িতে লোকও অনেক। কিন্তু জমা ধান-চাল থাকলেও টাকা-পয়সা সোনা-দানা বিশেষ নেই, ছ'জন ডাকাতের এক রাত্তিরের খরচা পোষাবে না।

কিন্তু টাকা পয়সা পাবার আশা না থাকলেও তো ওরা আসে। এমনি এমনি এসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ খুন করে। তাতে সন্দেহ হয়, ওরা বুঝি আসল ডাকাত নয়। ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। এই মানুষের ওপর কারুর রাগ আছে, অমনি কিছু টাকা খরচ করে লেলিয়ে দেওয়া হলো ডাকাত। হারুণ শেখের বেলাতেই পাকা হয় সন্দেহটা। টাকার জোর ছিল না তার মোটেই কিন্তু হিম্মতের জোর ছিল, কারুকে সে ছেড়ে কথা কইতো না, রামলাল ব্যাপারীকেও

সে যুগের একর জুড়ে নিয়েছিল। ডাকাতরা এসে তাকে কচু কাটা করে গেল নিশ্চয়ই অন্য কারুর প্ররোচনায়।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে অবশ্য সে রকম তেজী মানুষও কেউ নেই। তা বলে কি আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া হয় না কিংবা ভাই ভাইকে মারতে দা উঁচিয়ে তেড়ে যায় না। কিন্তু ঐ বাপ-মা তুলে গালমন্দ কিংবা তেড়ে যাওয়া পর্যন্তই. তার চেয়ে বড় কোনো ঘটনা অনেকদিন এখানে ঘটেনি।

তবু ভয় যায় না। নিজের অজান্তেই যে, ভিন্‌গাঁয়ের কারুর চক্ষুশূল হয়ে বসে আছে, তার ঠিক কী? তাছাড়া দু'পাঁচটি স্বাস্থ্যবতী কন্যা বা বউ তো রয়েছেই এ গ্রামে, সেও তো কম বিপদের কথা নয়। বাড়িতে অমন রমণী থাকা আর হরিণ পুষে রাখা তো একই কথা।

সন্ধ্যে হলেই ভয়ে গা ছমছম করে। গরম ভাতের গ্রাস মুখে তুলতেও সুখ আসে না। কারুর সঙ্গে কারুর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। ছোট কোনো বাচ্চা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে বড়োরা রেগে যায়, তারা বাচ্চাটাকে থাবড়া মারে।

ইদানীং আর এদিকে বাঘের উপদ্রব নেই। বুড়ো বুড়িদের মুখে শোনা বাঘের গল্প এখন পানসে লাগে। বাঘ তো ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেত না।

কেউ কেউ ভাবে, ডাকাতরা একবার এসে পড়লেই বাঁচি। রোজ রোজ এই ঘাড় শক্ত করে থাকা সহ্য হয় না। ডাকাতরা এসে একখানা-দুখানা বাড়ি পোড়াবে। দু'চারজনকে মারবে বড় জোর, তারপর তো অন্ত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা তা শোনে না। কাজে-কর্মে তাদের মাঠে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়। সন্ধ্যের পর একবার নদীর ধারে না গেলে তো চলবেই না।

নদীর ওপরে একটা বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো পার হয়ে ওপারের গ্রামে গেলে পাওয়া যায় মিষ্টি জলের পুকুর। ঐ পুকুরের জল ছাড়া ভাত রাঁধা যায় না। ঐ গ্রামে আছে বড় মুদির দোকান, সেখানে পাওয়া যায় নারকেল তেল। সেই গ্রাম পেরিয়ে তার পরের গ্রামে শুক্রবারের হাট।

সন্ধ্যের পর নদীর ধারে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সার বেঁধে বসে। তখন পুরুষ মানুষদের এদিকে আসা নিষেধ।

তবু একদিন প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায় ঐ সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল মধু পাইকারের ছেলে শ্রীধর। কেষ্ট ঠাকুরের মতন সে বাঁশী বাজায়। সেই শ্রীধর তেঁতুলছড়ি গ্রামের বাতাসীকে একলা পেয়ে কুপ্রস্তাব দিল। বাতাসী তো আর [illegible] মতন আলুথালু নয়, [illegible] নয়, বড় তেজী মেয়ে সে, জঙ্গল থেকে সে মস্ত মস্ত কাঠের বোঝা মাথায় করে আনে, একবার সে অমন ছ্যালা কাঠ দিয়ে একটা গোখরো সাপ পিটিয়ে মেরেছে। বংশীবাদক শ্রীধর যখন বাতাসীর হাত চেপে ধরতে গেল, তখন বাতাসী তাকে ঠেলে ফেলে দিল জলে। তারপর তার কী হি হি হি হি হাসি। সেই হাসি যেন মাছরাঙা পাখির ডাক!

এই ঘটনায় তেঁতুলছড়ি গ্রামে আরও জাঁকিয়ে বসলো ভয়। বাতাসী এ কাজটা খুব মন্দ করেছে। এখন শ্রীধর রাগের চোটে যদি ডাকাত লেলিয়ে দেয়?

এতদিনে সবার খেয়াল হলো যে কাঠকুড়ুনী বাতাসীর শরীরে একটা জেল্লা আছে। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছে সে, তার নিজের সাধ-আহ্লাদ না থাকতে পারে। কিন্তু তাকে দেখে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাধ আহ্লাদ তো জাগতেই পারে। যারা বাতাসীর দিকে আগে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি, এখন দেখতে শুরু করলো।

কেউ কেউ অবশ্য বললো, না, না, শ্রীধর অমন মানুষই নয়। সে একটু [illegible] হতে পারে, কিন্তু চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। তবু ভয়ের কাঁটা খচখচ করে। শ্রীধর না বলুক অন্য কেউ কেউ রটিয়ে দিতে পারে যে তেঁতুলছড়ি গ্রামে আছে বাতাসীর মতন এক আগুনের ঢেলা। আগুনের টানেই তো আগুন আসে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামের প্রবীণরা শলাপরামর্শ করতে বসে অশথতলায়। কারুর কারুর হাতে হুঁকো, কয়েকজনের হাতে বিড়ি। অনেক তামাক পুড়ে যায়, কোনো বুদ্ধি আসে না। কেউ কেউ বলে, বাতাসীকে এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কাঠ কুড়োনোই যার জীবিকা, সে তো যে-কোনো গ্রামেই থাকতে পারে, সাঁকোর ওপারে শ্রীধরদের গ্রামেই গিয়ে থাকুক। তারপর বাতাসীকে শ্রীধর মারে না ডাকাতরা মারে, সে তারা বুঝবে, তেঁতুলছড়ি গ্রামের লোক তো বাঁচবে!

কথাটা অনেকের মনঃপূত হয়, কিন্তু কে যে বাতাসী বা তার মাকে এই কথাটা বলবে, তা ঠিক হয় না। সকলেরই বুকের মধ্যে থাকে একই সঙ্গে গরম আর ঠাণ্ডা। যার মনে হয় যে বাতাসীটাকে তাড়াতে পারলেই শান্তি, সে-ই আবার ভাবে, যতদিন আছে থাক না, তবু তো [illegible] মেয়েটিকে দু'চোখ ভরে দেখেও খানিকটা আরাম পাওয়া যায়।

বাতাসীর মায়ের নাম তুলসী হলেও লোকে তাকে আড়ালে বলে কাঁদুনী। কারণ তার গলার আওয়াজটা খোনা খোনা। মা আর মেয়ে এই দু'জনের

সংসার। দু'জনেই শাদাবিধবা। গ্রাম-প্রধানদের প্রস্তাবটা ক্রমে বাতাসীর গাঁয়ের কানে আসে।

এক সন্ধ্যেবেলা অশথতলায় গিয়ে কাতুনী এক দঙ্গল পুরুষ মানুষের সামনে কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, হায় রে, এ গ্রামে কি পুরুষ মানুষ নেই! মিনসেগুলো আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়! আমরা কারুর সাতে-পাঁচে নেই, দিন আনি দিন খাই, ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে আমাদের? আজ যদি থাকতো চূড়ামণি… আজ যদি থাকতো চূড়ামণি…

চূড়ামণি নামটা শুনেই থেমে যায় সব গুঞ্জন। কেউ আর বিড়ি টানে না, যার হাতে হুঁকো, সে গুড়ুক টানতে ভুলে যায়। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। চূড়ামণি নামটায় যেন একটা যাদু আছে। অশথতলায় যারা জমায়েত হয়েছে তারা অনেকেই চূড়ামণিকে চোখে দেখেনি, কিংবা অল্প বয়সে দেখলেও এখন আর মনে নেই। কিন্তু সকলেই চূড়ামণির কথা শুনেছে। তার নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

শুধু এই তেঁতুলছড়ি গ্রাম নয়, আশপাশের পাঁচ দশখানা গ্রামের নয়নমণি ছিল ঐ চূড়ামণি। যেমন ছিল তার হাসিমাখা সুন্দর মুখ, তেমনই ছিল তার লোহার মতন বুকের পাটা। সংসারে আর কেউ ছিল না তার। যে-কোনো লোকের বিপদ আপদের কথা শুনলে সে দৌড়ে গিয়ে বুক পেতে দিত। একবার এ গ্রামের একটি শিশুকে কুমীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চূড়ামণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে। কুমীরটাকে ছিঁড়ে দু'ফাঁক করে দিয়েছিল সে।

এই কাহিনীর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনায় রঙীন তা এখন জানার উপায় নেই। এখন নদীটিকে দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত যে কোনো দিন এখানে কুমীর আসা সম্ভব ছিল, তবু লোকে চূড়ামণির ঐ বীরত্বের কথা বিশ্বাস করে। আরও অনেক কথা রটেছে তার নামে। সে নাকি একবার শুধু কয়েকটা ধমক দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিল। এক দুর্দান্ত ডাকাতের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে চূড়ামণি তার চুল ধরে এমন টান দিয়েছিল যে সেই মুহূর্তে ডাকাতটি ন্যাড়া। সারা জীবনে তার মাথায় আর চুল গজায়নি। নিশ্চয়ই অনেক গুণ ছিল চূড়ামণির, নইলে তার নামেই বা এতসব কথা রটবে কেন?

যখন পূর্ণ যৌবন বয়েস তখন হঠাৎ-ই একদিন চূড়ামণি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় চিরতরে। কেন যে সে গেল, কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে জনশ্রুতি আরও বাড়তে থাকে। যে-কেউ বিপদে

পড়লেই কপাল চাপড়ে বলে, আজ যদি চূড়ামণি থাকতো, তা হলে আর দুঃখ ছিল না!

এসব তিরিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। অনেকদিন পর বাতাসীর মা কাতুনির মুখে শোনা গেল সেই শেষ বাক্য। অমনি সকলের মনে পড়ে গেল!

এরপর কয়েকদিন ঘোড় সওয়ার ডাকাতদের কথা উঠলেই কেউ না কেউ বলে ওঠে, হায় রে, আজ যদি চূড়ামণি থাকতো! দুর্দমনীয় ডাকাতদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সেই অতীতের চূড়ামণি।

নতুন করে চূড়ামণির কীর্তি-কাহিনীর কথা মুখে মুখে ছড়ায়, অল্প বয়েসীরা রোমাঞ্চিত হয়ে শোনে। সবাই ভাবে, চূড়ামণি থাকলে সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। সে নেই, তাই এত দুর্দশা। ডাকাতগুলো এসে কবে যে কার গলা কাটবে তার ঠিক নেই।

এর মধ্যেই একদিন অন্য গ্রামে আর একবার ডাকাতির খবর এলো! অর্থাৎ তারা থেমে নেই। তেঁতুলছড়ি গ্রামে তারা একদিন না একদিন আসবেই! পাশের গ্রামে শিবুকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি তবে ঐ ডাকাতদের দলেই গেছে? শীতের রাতে বাতাসী তাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

বাতাসীর অবশ্য বিশেষ ভয় ডর নেই। সন্ধ্যে পার হলে নদীর ঘাট থেকে অন্য স্ত্রীলোকেরা চলে এলেও সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে নদীর ধারে।

জোৎস্নায় ধু ধু করে ওপারের মাঠ। দূরের তালগাছগুলোকে মনে হয় সারি সারি দৈত্য অপলক। বাতাসে মিশে থাকে ভীরু মানুষের নিঃশ্বাস। বাতাসী তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। সে যেন হঠাৎ কল্পনায় দেখতে পায় চূড়ামণিকে। সেই এক রূপবান যুবক, পরের দুঃখে যার পাথরের মতন বুকখানা চওড়া। সে হাত তুলে অভয় দেখিয়ে আসছে, সে বাতাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি তো আছি, তোমার ভয় কী!

যারা অল্প বয়েসে চলে যায়, তাদের বয়েস বাড়ে না।

কিছুদিন ধরে চূড়ামণির কাহিনী খুব চলবার পর ছিরু বৈরাগী একটা অদ্ভুত কথা শোনালো। চূড়ামণি ঠাকুর মারা যায়নি গো, নিরুদ্দেশেও যায়নি! ছ'মাস আগেই ছিরু বৈরাগী তাকে দেখেছে শিমুলী নদীর বাঁকে কানা ফকিরের আখড়ায়। অবশ্য এখন তাকে চেনাই যায় না, সে এখন বুড়ো, নেশাখোর আত্মবিস্মৃত। সব সময় কাঁদে। চূড়ামণি ঠাকুর এখনো শুধু নিজের নামটা শুনলে জেগে ওঠে।

বলো তো বাছা, তোমার দুঃখ কথানি।

বাত্তাসী তখন সব কথা সাত কাহন করে সবিস্তারে শোনালো।

এই শুনে কানা ফকির দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললো, ওরে চূড়ামণি, তুই অবোধমণি হয়ে আছিস। তোর গ্রামের মানুষের মাথায় বিপদের খাঁড়া, তুই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়া। সাঁই-এর কৃপা হলে তুই আবার ফিরে আসবি।

দড়ি পাকানো চেহারার বুড়োটি এই আদেশ শুনে কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।

কানা ফকির তার দিকে ছিলিম এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে বেটা! দু'টান দে! তারপর সুস্থ হয়ে সব কথা খুলে বল। আহা রে, এরা এসেছে কত দূর থেকে তোর নিয়তি ধরে টান দিতে। এই মাটিটির বদন যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেছে। এদের সাথে না যাস যদি তবে তোর মুক্তি হবে না। তুমি ঐ! তুমি ঐ!

ছিলিমে কয়েক টান দিয়ে সেই দড়ি-পাকানো চেহারার লোকটি অনেকটা তাজা হয়ে বললো, বাবা, তুমি সব পারো! এরা যা চায়, তুমিই তাই মিটিয়ে দাও না! এই বুড়োকে নিয়ে টানাটানি কেন?

আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর কানা ফকিরের চরম আদেশ হলো এই যে, দড়ি-পাকানো চেহারার চূড়ামণিকে যেতেই হবে তেঁতুলছড়ি গ্রামে। বাত্তাসীকে তিনি বললেন, যাওয়ার পথে ওরা যেন চূড়ামণিকে কোনো পুকুরের পানিতে চুবিয়ে নিয়ে যায়। তাতে ওর জ্ঞান ফিরবে!

বাত্তাসী আর তার দলবল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে চললো চূড়ামণিকে। এ বুড়োকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কী উপকার হবে? তাও সে নিজে চলতে পারে না, ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে। এক একবার চেঁচিয়ে ওঠে। বড় তৃষ্ণা! জল রে, জল। গুরু, তুমি কোথায় পাঠাচ্ছো আমাকে? তুমি ঐ!

খানিক দূর যাওয়ার পর পথের পাশে দেখা গেল এক পুষ্করিণী। কানা ফকিরের কথা মতন বাত্তাসীরা বুড়োটাকে সেখানে ঠেলে ফেলে দেবার উদ্যোগ করছে, তার আগেই সে ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে উপুড় হয়ে পড়লো। চোঁ চোঁ শব্দ হতে লাগলো এবং এক পুষ্করিণী ভর্তি জল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পান করে নিল চেটেপুটে।

তারপর পাড়ে উঠে এসে সে কাঁদতে লাগলো। অস্ফুটভাবে বলতে থাকলো, যে-দেশে ভালোবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! এই একই কথা বারবার

বলতে লাগলো আর ঝরতে লাগলো তার চোখের জল। সে কী কান্না! ক্রমে তার চোখের জলেই আবার প্রায় ভরে গেল সেই পুকুরটা।

এই কাণ্ড দেখে বাত্তাসী ও তার দলবলের বাক্যরহিত হয়ে গেছে। তারা আরও চমৎকৃত হলো, যখন সেই বৃদ্ধ বাত্তাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তুলসী না? ডাক নাম কাজলী?

পাশের ছেলেটিকে বললো, তুমি ভুধর না? তার পাশের ছেলেটিকে বললো, তুমি তো একলাস? আর তুমি মইনুদ্দিন?

একে একে প্রত্যেকের বাবা-মায়ের নাম নির্ভুল বলে গেল সে। তখন আর সন্দেহ রইলো না যে, এই লোকটিই প্রকৃত চূড়ামণি। সে নতুনদের চেনে না। পুরোনোদের চেনে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছোবার আগেই আরও কিছু কাণ্ড হতে গেল চূড়ামণিকে নিয়ে। কয়েক পা ধরে হাঁটার পরই সে বসে পড়ে আর হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে বলে, ওগো, আমায় নিয়ে যাচ্ছো কেন? ডাকাত তাড়াবার মতন শক্তি কি আমার আছে? আমি যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি!

কিন্তু বাত্তাসীরা তখন তাকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ বুড়োকে দিয়ে ডাকাত আটকানো যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতকালের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ চূড়ামণিকে দেখে গ্রামের মানুষ আবার তো নতুন করে গল্পের উপাদান পাবে! একটা মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে, এ রকম ঘটনা গ্রামে তো সচরাচর ঘটে না। চূড়ামণির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তো তারা একটু আগে নিজের চোখেই দেখলো।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছোবার প্রায় এক ক্রোশ আগে চূড়ামণি হঠাৎ বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। অন্যদের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো, এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি? তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে?

বাত্তাসী বললো, ঠাকুর, তুমি ফিরে যাচ্ছো তোমার নিজের গ্রামে। তোমার গ্রামের নাম তেঁতুলছড়ি, মনে নেই?

চূড়ামণি জিজ্ঞেস করলো, সেখানে কী ভালোবাসা আছে?

বাত্তাসী চট করে উত্তর দিতে পারলো না। অন্যরাও নিরুত্তর। ভালোবাসার

কথা কেউ জানে না।

চূড়ামণি থেমে থেমে উঠলো, যে দেশে ভালোবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! আমি তেঁতুলঝুড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কেন জানিস? সেখানে কেউ কাউকে ভালোবাসে না।

বাতাসী চূড়ামণির হাত ধরে কাতরভাবে বললো, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বড় বিপদ, তুমি আমাদের বাঁচাও। তোমাকে সবাই ভালোবাসবে।

চূড়ামণি আকাশের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বললো, তুমি ঐ! তুমি ঐ! কে কাকে বাঁচায়? কে কাকে মারে? মানুষ নিজেকেই নিজে মারে। নিজেকেই নিজে বাঁচায়।

বাতাসী এবার হাঁটু গেড়ে চূড়ামণির পা চেপে ধরলো।

চূড়ামণি একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে। আবার তার চোখ ছলছল করে আসছে। তার মুখে কথা নেই। সন্ধ্যের আকাশ জুড়ে কালি কালি মেঘ। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বাঁশ বনে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের রা।

চূড়ামণি একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে কাতরভাবে বললো, আমার শরীরের তাগৎ কমে গেছে। তোরা একটু একটু ভালোবাসা দিলে যদি শক্তি ফিরে পাই! দিবি? তোরা ভালোবাসা দিবি?

বাতাসী বললো, আমার বুকে যত ভালোবাসা আছে সব তোমায় দেবো।

গঙ্গাধর, কামাল, মানিকচন্দ্র, সইফুদ্দিনরাও বললো, হ্যাঁ দেবো, হ্যাঁ দেবো।

চূড়ামণি হাত বাড়িয়ে বললো, দে, ভালোবাসা দে।

এমনভাবে কী ভালোবাসা দেওয়া যায়! মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো সকলে।

চূড়ামণি এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশ ঝাড়ের সামনে দাঁড়ালো। একটা বাঁশ ধরে টানাটানি করে বললো, আহ, বুড়ো হয়ে গেছি, হাড় ঝুনো হয়ে গেছে, শরীরে বল নাই। তোরা ভালোবাসা দে, তবে যদি মনের বল ফিরে পাই! তোরা আমার গায়ে হাত বুলা।

তখন সবাই চূড়ামণিকে ঘিরে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো। বাতাসী তার মুখখানা ঘষতে লাগলো চূড়ামণির পিঠে।

আস্তে আস্তে যেন চূড়ামণির শরীর সোজা হয়ে যেতে লাগলো, খুলে গেল চুলের জট, চাপা পড়ে গেল হাড়ের শিরা-উপশিরা, চক্ষে ফুটে উঠলো জ্যোতি।

চূড়ামণি হুঙ্কার দিল, তুমি ঐ! তুমি ঐ!

তারপর এক টানে সে পট্ করে তুলে ফেললো একটা মস্ত বড় বাঁশ।

তাই দেখে বাতাসী আর গঙ্গাধর আর কামালরা নাচতে লাগলো ধেইধেই

করে। ওদের ভালোবাসার যে এত জোর তা তারা নিজেরাই জানতো না এতদিন।

চূড়ামণি বাঁশটাকে মাটিতে ফেলে উল্টোদিকে ফিরে দু'হাত জোড় করে বললো, আমার গুরু কানা ফকির, তিনি সব দেখতে পান, তিনিও কাঁদছেন তোদের জন্য। বাবা, তুমি আর কেঁদো না, এরাই এখন আমায় সামাল দেবে।

আবার খানিক দূরে যাবার পর চূড়ামণি দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমার যে বড় খিদে পেয়েছে। কে আমাকে খেতে দেবে?

বাতাসী বললো, ঠাকুর, আর মাত্র দু' ক্রোশ পথ। তুমি গ্রামে গেলে সবাই তোমাকে খাবার দেবে।

চূড়ামণি বিস্ময়ভাবে বললো, সবাই আমাকে খাবার দেবে? বলিস কী?

বাতাসী আর তার সঙ্গীরা একসঙ্গে বললো, হ্যাঁ ঠাকুর দেবে।

চূড়ামণি বললো, আমি যে অনেক খাই!

— তুমি যত চাও সব দেবে। তুমি পেট ভরে খেও।

—সত্যি দেবে? শেষে কথা ফিরাবি না তো?

ওরা গ্রামে পৌঁছোবার পর এমন হৈ চৈ পড়ে গেল যে, এদিক-ওদিকের গ্রামের লোক ভাবলো ডাকাত এসেছে বুঝি!

ভিড় ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে ছিরু বৈরাগী বললো, হ্যাঁ, এই তো সেই মানুষ! বাতাসী অতদূর থেকে ধরে এনেছে, অসাধ্যসাধন করেছে মেয়েটা।

কিন্তু অনেকে মানতে চায় না। অনেকেরই চোখেই সন্দেহ। এই কি সেই অজেয় বীর চূড়ামণি? এই মাথার চুল পাকা, থলথলে বুড়ো? এ রকম চেহারার মানুষ তো যে-কোনো শ্মশানঘাটে দেখতে পাওয়া যায়!

তাদের চোখে চূড়ামণির চেহারা হবে নব কার্তিকের মতন। কোথায় সেই কপাট বুক, কোথায় সেই চোখের দীপ্তি! পঁচিশ বছর আগে যে উধাও হয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসতে পারে?

তবু কেউ কেউ বললো, হ্যাঁ, এই-ই সেই। অন্যরা প্রতিবাদ করে ওঠে। ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে ছুটে এসে ঐ বুড়োকে দেখে থমকে যায়। হতাশায় তাদের মুখ ঝুলে পড়ে।

প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমেই। বাতাসী আর তার সঙ্গীরা আসার পথে যা যা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছে তা বলতে গেলেই হা হা করে হেসে ওঠে অনেকে। এই অপদার্থটা এক পুকুর জল শুষে খেয়েছে, একটা আড় তলতা বাঁশ উপড়ে তুলেছে? গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাওনি? এই লোকটা তো গাঁজাখোর বটেই, বাতাসীরাও কি গাঁজা টেনে এসেছে কানা ফকিরের

আখড়া থেকে ?

চূড়ামণি কোনো কথা বলে না, কোনো সাড়া শব্দ করে না। চুপ করে বসে থাকে অশত্থতলার চাতালে। ক্রমেই সে যেন বেশি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হৈ হৈ করে উঠতে সে একপাশে ঢলে পড়লো। অজ্ঞান হলো না মরেই গেল তা বোঝা গেল না।

চূড়ামণিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে দেখে এক নিমেষে থেমে গেল গোলমাল। সবাই থমকে গেছে।

বাতাসীর মা কাদুনী ছুটে এসে চূড়ামণির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে বলে উঠলো, এগো, তোমরা ওকে মেরে ফেললে? মানুষটা আদ্দিন বাদে ফিরে এলো তাকে তোমরা কেউ কিছু দিলে না?

বাতাসীর মনে পড়লো, মানুষটা বলেছিল খিদে পেয়েছে।

ছিরু বৈরাগী বললো, ওর নাম ধরে ডাকো। ওকে ডাকলে ও জেগে ওঠে।

বাতাসীরও সেই কথাই মনে হলো। কানা ফকিরের আশ্রমের নাম শুনেই চূড়ামণি উঠে বসেছিল।

সে চূড়ামণির কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো, চূড়ামণি ঠাকুর! চূড়ামণি ঠাকুর! ফিরে এসো!

আরও অনেকে সেই নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলো।

ছিরু বৈরাগী দু' হাত তুলে সকলকে উদ্দেশ করে বললো, সবাই ডাকো! সবাই ডাকো! জোরে, আরও জোরে।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে যারা অবিশ্বাসী তারাও গলা মেলালো। যখন আর একজনও বাকী রইলো না, সবাই সমস্বরে ডাকছে, তখন চোখ মেললো চূড়ামণি। আস্তে আস্তে উঠে বসে বললো, আমায় ডাকছিলে কেন গো? আমি তো দিব্যি ফিরে যাচ্ছিলুম, কেন ডেকে আনলে?

ছিরু বৈরাগী বললো, মানুষটা এতদিন বাদে গ্রামে ফিরলো, তোমরা কেউ ওকে একটু খেতেটেতে দেবে না? অন্তত একটু জল মিষ্টি দাও।

বাতাসী বললো, চূড়ামণি ঠাকুর, তুমি আমাদের বাড়ি চলো, তোমাকে ভাত বেঁধে খাওয়াবো।

চূড়ামণি বাতাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে সমস্ত মানুষদের দেখলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তুমি ভাত খাওয়াবে? তবে যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ আমায় খাওয়াবে?

বাতাসীর মা কাদুনী বললো, আমরা কাঠকুড়ুনী, তবু তোমায় পেটভরা ভাত

দিতে পারবো। চলো ঠাকুর।

চূড়ামণি তবু বাতাসীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ খাওয়াবে? তুমি কথা রাখলে না।

তারপর অবুঝ শিশুর মতন মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগলো, না, আমি খাবো না। সবাই মিলে আমায় না খাওয়ালে আমি খাবো না।

সবাই অবাক। একটা মানুষের জন্য সব বাড়িতে রান্না হবে নাকি? এ কি মানুষ না রাক্ষস?

ছিরু বৈরাগী বললো, আরে না, না, চূড়ামণি ঠাকুর সে কথা বলেনি। তোমরা সব বাড়ি থেকে পাঁচ দানা করে চাল দাও। তারপর সেই চাল একত্র করে একজন কেউ ফুটিয়ে দিক। তাহলেই সবাই মিলে খাওয়ানো হবে।

একটা মাটির সরা নিয়ে বাতাসী আর অন্য ছেলেরা ঘুরলো সব বাড়ি বাড়ি। গ্রাম শেষ করে ঘুরে আসার পরেও, সেই সরা অর্ধেক ভরলো না।

বাতাসী সেই সরাটা এনে ছিরু বৈরাগীর সামনে এসে খুব দুঃখী গলায় বললো, এইটুকু চালে কি এত বড় মানুষটার পেট ভরবে? তুমি কেন মাত্র পাঁচ দানা বললে?

সেই কথা শুনে চূড়ামণি মিটিমিটি হেসে ছিরু বৈরাগীর দিকে তাকালো। ছিরু বৈরাগী কপাল চাপড়ে বললো, ওরে, ভিক্ষের তণ্ডুল আমি ভালোই চিনি! সবাই পাঁচ দানা দেয়নি। কেউ কেউ দিয়েছে তিন দানা, কেউ কেউ দিয়েছে দু' দানা, কেউ কেউ দিয়েছে ফাঁকি! যে গ্রামের মানুষ এত ঠক হয়, সে গ্রামের মানুষকে ডাকাতে মারবে না তো কী?

তখন লজ্জা পেয়ে আরও অনেকে দু' দানা, তিন দানা করে চাল দিয়ে গেল। শুধু তিনজন এসে বললো, আমাদের ঘরে এক দানাও চাল নেই, ঠাকুর। দোষ নিও না। ইচ্ছে থাকলেও দেওয়ার সাধ্য নেই। আর একদিন দেবো।

বাতাসী ভাত ফুটিয়ে এনে কলাপাতায় বেড়ে দিল। সঙ্গে একটু নুন, দুটি লঙ্কা। সেই ভাতই অমৃতের মতন খেল চূড়ামণি। তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

ছিরু বৈরাগী বললো, ঠাকুর, এবার তুমি একটু শোও। আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও। কত দূর থেকে এসেছো? কাল সব কথা শুনবো।

কিন্তু বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল না। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আসছে! আসছে! নদীর ওপারের মাঠে মশাল জ্বেলে এসেছে, ডাকাতরা আসছে!

সবাই একেবারে তাকালো চূড়ামণির দিকে। এইবার ঠাকুর, আসল না নকল ঠাকুর প্রমাণ দাও! দেখি তোমার কেমন মুরোদ!

বাতাসী ব্যাকুলভাবে বললো, ঠাকুর, ওঠো, ডাকাতরা আসছে।

চূড়ামণির মুখে ভয়ের ছায়া। শরীরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে মিশে যেতে চায়।

বাতাসী তার হাত ধরে টেনে বললো, ঠাকুর, ওঠো! নদী পেরিয়ে ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

চূড়ামণি কাতরভাবে বললো, আমি ঠাকুর নই, আমি শুধু চূড়ামণি। আমি কী করে পারবো অতগুলো ডাকাতের সঙ্গে? আমার যে শরীরে আর নেই শক্তি নেই। আমাকে তোমরা ভালোবাসা দাও।

বাতাসী তখনি উন্মাদিনীর মতন সকলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো, ওগো, তোমরা সবাই এসো। চূড়ামণি ঠাকুরকে ভালোবেসে ছুঁয়ে দাও। হাত বুলিয়ে দাও।

ডাকাতরা এসে পড়লো বলে, আর দ্বিধা করার সময় নেই। সবাই ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো চূড়ামণির গায়ে মাথায়।

চূড়ামণি বলতে লাগলো, আরও দাও, আরও ভালোবাসো। ভালোবাসায় আমার মন ভরে না! আরও দাও!

বাতাসী চুমো দিতে লাগলো চূড়ামণির সারা শরীরে। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও। সে কি ব্যাকুলতা। যেন মাঝখানে চূড়ামণি নেই, সবাই সবাইকে চুমু দিচ্ছে।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সবাইকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো চূড়ামণি। দুদিকে দু'হাত ছড়িয়ে বললো, এবারে আমি বল পেয়েছি! আর ভয় নেই!

সকলেই দেখলো, চোখের নিমেষে যেন রূপান্তর হয়েছে চূড়ামণির। তার শরীরে ঝক ঝক করছে তেজ। তার ম্লান মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, সেরকম হাসি আগে কেউ কখনো দেখেনি। তার বুক যেন লোহার কপাট আর দুই হাত যেন মুগুর। মাথার চুল তো পাকা নয়, ধুলোবালি মাখা।

চূড়ামণি বললো, আমার অস্ত্র কই?

ডাকাতদের কাছে কত মারাত্মক অস্ত্র থাকে, তাদের বিরুদ্ধে চূড়ামণি একা খালি হাতে দাঁড়াবে কী করে? একটা অস্ত্র তো নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু এ গ্রামে লাঠি-সোঁটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু রত্নমণির কাছে আছে একটা রাম দা। সে সেটাই এনে দিল।

চূড়ামণি বললো, শুধু ওতে তো হবে না। সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু চাই। আর যদি কিছু দিতে না পারো তো, প্রত্যেকে মাথা থেকে একগাছা চুল

ছিঁড়ে দাও!

সবাই পট পট করে ছিঁড়তে লাগলো মাথার চুল।

বাতাসী নিজের চুল ছিঁড়তে যেতেই কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর। একটা সাঙ্ঘাতিক ভয়ের তরঙ্গ। এই মানুষটা পারবে তো? ডাকাতরা এসে যদি এক কোপে এর মাথাটা কেটে ফেলে?

সে ফিসফিস করে বললো, ঠাকুর, তুমি পালাও, তুমি পালাও! তুমি ডাকাতদের সামনে যেও না।

ডাকাতরা নদী পেরিয়ে এসেছে, খপাখপ খপাখপ শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অন্য সবাই ভয়ে পালাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে।

চূড়ামণি বললো, এখন আর কোথায় পালাবো? আর যে উপায় নেই!

বাতাসী বললো, তুমি কি পারবে ওদের সঙ্গে? একলা কি কেউ পারে? তোমায় ওরা ছাড়বে না!

চূড়ামণি বললো, পালালেই গ্রামের লোক কি আমায় ছাড়বে? আর যদি বা ডাকাতদের সঙ্গে পারি, কিন্তু তারপর আমার কী হবে? আমার ভয় করছে নিজের জন্যে। তারপর আর আমি মানুষ থাকবো না। বাতাসী, আমার খুব মানুষ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে!

বাতাসী বললো, তুমি মানুষ থাকবে না তো কী হবে?

চূড়ামণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, মাটি! মাটি!

মূল রাস্তার ওপরে এসে গেছে ডাকাতেরা। চূড়ামণি দৌড়ে মাঝ রাস্তায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিল, তুমি ঐ!

এই প্রথম দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল থমকে গেল।

পর পর ছ'জন ঘোড় সওয়ার, তাদের সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, তাদের মুখও দেখা যায় না। তাদের তিন জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

চূড়ামণি নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে হাতের চুলের গোছাটার সঙ্গে মেশালো। তারপর সেই গোছাটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তোরা আগে এইটা কাট, তারপর আমার মাথা কাটবি।

একজন ঘোড় সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সে চুলের গোছাটা কাটার জন্য তলোয়ার তুলতেই অট্টহাসি করে উঠলো চূড়ামণি। সে হাসিতে যেন মেঘের গর্জন। সে হাসিতে সমুদ্রের ঢেউ।

তলোয়ারের প্রচণ্ড কোপে সেই চুলের গোছার একটাও কাটলো না। ডাকাতের সর্দারটি পরপর তিনটি কোপ লাগালো, চতুর্থ কোপে দু'টুকরো হয়ে গেল তার তলোয়ার।

চূড়ামণি আবার হেসে উঠে বললো, আর একটা অস্ত্র আন্। এবারে আমার মাথায় একটা কোপ মেরে দ্যাখ কী হয়!

ডাকাতদের সর্দার তার তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চূড়ামণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পিত গলায় বললো, ঠাকুর, আমরা অনেক পাপ করেছি। তুমি আমাদের কী শাস্তি দেবে দাও! আমরা তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

চূড়ামণি তার ডান হাতটা তুলে ডাকাত সর্দারের মাথার ওপরে রাখলো।

অন্য ডাকাতেরা ঘোড়া থেকে নেমে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো দূরে।

চূড়ামণি আর ডাকাত সর্দার সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রইলো। আস্তে আস্তে তাদের দু'জনেরই শরীর থেকে খসে খসে যেতে লাগলো মাংস, তাদের হাড়ের খাঁচাটা হয়ে গেল কঠিন, তার ওপর লাগলো মাটি আর রং।

যারা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে এলো, কাছে এসে গোল হয়ে দাঁড়ালো। কেউ কেউ উচ্চারণ করতে লাগলো স্তোত্র, কেউ কেউ নিয়ে এলো ফুল আর বেল পাতা। শুধু বাতাসী ভাসলো নয়ন জলে!

সেতুর ওপরে

গড়বন্দীপুরের ছেলেরা আমাকে একটা সাইকেল দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় যা জল কাদা! সাইকেল আনলেই বরং বিপদ হতো, সে সাইকেল ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে হতো। তারচেয়ে নিজের দুটো পায়ের ওপর ভরসা করাই অনেক বেশি নিরাপদ।

কাদার রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস আমার আছে। সুন্দরবনের চেয়ে বেশি কাদা তো আর কোথাও নেই। সে একেবারে এঁটেল মাটি, কোথাও কোথাও হাঁটু ডুবে যায়। সেই তুলনায় এই রাস্তা এমন কিছু ভয়ের নয়।

পাজামা গুটিয়ে নিয়েছি উরু পর্যন্ত, পাঞ্জাবীটা কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে নিয়েছি। হাতে একটা লাঠি থাকলে ভাল হতো, তাল সামলানো যেত, অন্ততপক্ষে একটা ছাতা। বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে ঝিরিঝিরি, সকাল-সন্ধে নেমে আসছে।

বৃষ্টির মধ্যেই পথে মানুষ জন প্রায় নেই। তা ছাড়া আজ হাট বার নয়। সন্ধে সময় হাঁটাহাঁটি করার কারই বা গরজ পড়েছে! গড়বন্দীপুরে ওরা আমাকে রাতটা থেকে যাবার জন্য খুব অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আমার আজ রাতের মধ্যেই মুক্তিপুরে পৌঁছোতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে খুব ভোরে।

মাঝখানে আছে বৈধা নদী। এমনিতে একেবারে ছোট একটা শান্ত নদী। জেলার ম্যাপে সুতোর মতন একটা দাগ আছে, দেশের ম্যাপে নামগন্ধও নেই। অন্য সময় হেঁটেই পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার কয়েকটা মাস বড় জ্বালাতন করে! শান্তশিষ্ট নদী, তবু কোনো কোনো বছরে জল উপচে বন্যায় দশখানা গ্রাম ভাসায়। নদীটার ভাল নাম ছিল বিধা। সবাই সেটা ভুলে গেছে, এখন বৈধা নামেই ডাকে।

বেলাবেলি ঐ বৈধার ব্রিজটা পেরিয়ে যেতে হবে। পুরোনো আমলের কাঠের ব্রিজ, নড়বড় করে, কোথাও কোথাও তক্তা খুলে গেছে, আচমকা সেখানে পা পড়লে আর রক্ষে নেই। অনেকদিন থেকেই ব্রিজটার এই দশা দেখে আসছি।

আকাশে এখনো একটু একটু আলোর ইশারা আছে, তার মধ্যে ব্রিজটা পার হয়ে যেতে পারলে হয়। একটু পরেই তো চরাচর একেবারে মিশমিশে অন্ধকারে ডুবে যাবে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিজটা। একবার পেছন ফিরে দেখলুম গড়বন্দীপুরের দিকে আকাশ আবার ঘন কালো, আবার নতুন উৎসাহে ঝড় বৃষ্টি তেড়ে আসবে। লম্বা লম্বা গাছগুলোর মাথা নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

আমার পাশে পাশে টোকা মাথায় একজন লোক হাঁটছিল, সে হঠাৎ ডান দিকের মাঠে নেমে গেল। এবারে সামনের দিকে আমাকে একাই যেতে হবে। কাদার মধ্যে যতটা সম্ভব জোরে পা চালালুম।

বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট ধরানো যায় না এই একটা অসুবিধে। সিগারেটের বদলে গুনগুন করে গান ধরলে সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যায়।

ব্রিজের কাছাকাছি এসে একটা ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ শুনতে পেলুম যেন। এদিকে কোথাও কাঠ চেরাই কল আছে নাকি? মনে তো পড়ে না! চোখ দুটোকে এবারে সতর্ক করে নিলুম। এবারে সাবধানে মেপে মেপে পা ফেলতে হবে। এই সন্ধেবেলা আমি পা হড়কে নদীতে পড়ে সাঁতার দিতে চাই না। বৈধা নদী বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় উবু হয়ে বসে আছে একটা লোক। ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। কী করছে লোকটা?

কাছে এসে দেখি সে একটা করাত নিয়ে ব্রিজের তক্তা কাটছে মন দিয়ে। আমি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছি তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রথমে আমার মনে হলো, ও বুঝি পি ডব্‌লু ডি-র লোক। সেতু সারাই করতে এসেছে।

ওকে পার হয়ে একটুখানি যাবার পর আমার খটকা লাগলো। গভর্নমেন্টের লোকের কাজে এত দরদ? এই দুর্যোগের দিনে সন্ধেবেলা একা একা কাজ করে যাচ্ছে? কাছাকাছি দেখবার কেউ নেই তবুও? এই সময় তো ওর নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে তেলেভাজা আর মুড়ি খাবার কথা!

তা হলে লোকটা নিশ্চয়ই চোর। কাঠ চুরি করছে। এই সন্ধেবেলা কেউ দেখবার নেই, এই তো সুযোগ!

ঝপাং করে একটা শব্দ হলো। একটা বড় কাঠের টুকরো পড়লো নদীর জলে আর কোনো সন্দেহ নেই। লোকটা কাঠ কেটে কেটে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই ওর কোনো স্যাঙাৎ লুকিয়ে আছে, সে ভাসমান কাঠগুলো তুলে নেবে।

আমার মনে এক ধরনের বাষ্প ছড়িয়ে গেল, সেটা তিক্ততা আর বিরক্তির মাঝামাঝি। এরা কি নিজেদের ভালো মন্দ কোনোদিন বুঝবে না? বৈধা নদীর মধ্যে এই একখানি মাত্র সেতু, সামান্য কাঠের লোভে সেটা ওরা নিজেরাই ধ্বংস করছে? এই সব রাস্তার শহরের লোক আর কটা আসে, গ্রামের মানুষই তো এটা ব্যবহার করে।

একবার মনে হলো, আমার কি দরকার, যা হয় হোক। আমি তো আর এখানকার বাসিন্দা নই। এরা নিজেরাই ফল ভোগ করবে।

তবু থমকে দাঁড়ালুম, আমরা অনেক কিছু দেখে যাই, মনে মনে সমালোচনা করি, কিন্তু প্রতিবাদ বা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিই না। এখানে যদি তিন চারটে চোর এক সঙ্গে থাকতো, তা হলে আমার পালানো ছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু ঐ লোকটা একা, আমিও একা, সুতরাং ওকে আমার ভয় পাবার কি আছে?

ফিরে এসে বললুম, ওহে, তুমি এ কী করছো?

আজকাল চোরেরা অনেক বেশি দুঃসাহসী। বাবু শ্রেণীর মানুষদের গ্রাহ্যই করে না।

লোকটি মাঝবয়সী, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান, মুখ ভর্তি দাড়ি। পরনে একটা লুঙ্গি আর খালি গা। আমার কথা শুনে মুখ না তুলে অবহেলার সঙ্গে বললো, দেখতেই তো পাচ্ছো, কাঠ কাটছি!

আমি বললুম, কিন্তু এটা কি কাঠ কাটবার জায়গা? কাঠ কাটতে চাও তো জঙ্গলে যাও নি কেন, এটা ব্রীজ!

লোকটি বললো, তোমার যেমন চক্ষু আছে, আমারও তেমন চক্ষু আছে। আমি জানি এটা একখানা সেতু। একটা বট গাছ নয়কো!

— তা জেনেও তুমি এটাকে কাটছো? এটা ভেঙে পড়বে যে?

—তা জেনেই তো কাটছি, আর দু'খানা খুঁটির জোড় সরাতে পারলেই এটা ভেঙে পড়বে! প্রায় হয়ে এসেছে!

—অ্যাঁ, জেনে শুনে তুমি এটার সর্বনাশ করছো? এই বর্ষায় লোক নদী পার হবে কি করে? তোমাদের মতন গ্রামের মানুষরাই তো......

আর একখানা কাঠ শব্দ করে জলে পড়লো, লোকটি এবারে আমার দিকে

ফিরে বললো, তোমার বয়েস কত ? তুমি এই সেতুটি আগে দেখেছো, না নতুন এসেছো ?

আমি বললুম, একেবারে নতুন নয়। আগে দু'তিনবার এসেছি।

—আগে যখন দেখেছো, তখন কি এটা টাটকা, মজবুত ছিল ?

—না, তা ছিল না বটে !

—মাঝে মাঝে একখান দু'খান তক্তা খসে পড়ে, লোকে সারিয়ে নিয়ে যায়। এই সেতু সারাই করার কথা কেউ ভাবে না। সরকার বাহাদুরও ভাবে না। বাপের আমল থেকে যেমন নড়বড়ে দেখেছি, এখনও তাই। কী বলো ? এবারে আমি একে একেবারে শেষ করে দিচ্ছি, আর একটু পরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।

—কী সর্বনাশ, আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ! একটু দেরি হলে—

—হ্যাঁ, তুমিই শেষ মানুষ পার হলে !

—তবু এটাতে কাজ চলে যাচ্ছিল, তুমি শেষ করে দিচ্ছো কেন ?

—এ কাজ চলছিল বলেই তো গণ্ডগোল। কোনো মতে কাজ চলে গেলে কেউ আর নতুনের কথা ভাবে না। এবারে দেখবে, আর কাজ চলবে না, লোকে নতুন চাইবে !

আমি শিউরে উঠলাম এ লোকটা চোর না দার্শনিক ! কিংবা অতিপ্রাকৃত কেউ নয় তো ? এই বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যেবেলা বসে বসে একটা সেতু ধ্বংস করছে ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওহে কর্তা, তুমি কোন গ্রামে থাকো ? তোমার বাড়ি কোথায় ?

লোকটি বললো, আমার বাড়ি নেই। থাকি এই মাঠখানা পেরিয়ে যে গ্রাম সেখানে।

—গ্রামে থাকো, তোমার বাড়ি নেই মানে ? অন্য বাড়িতে কাজ করো ?

—না, তা নয়। ছিল আমার একখানা বাড়ি। এই সেতুটার মতনই নড়বড়ে। এখানে সেখানে মেরামত করে আর কুলোয় না। একদিক ঢাকি তো আর একদিক দিয়ে জল পড়ে। তাই ভাবলুম, দূর, এ দিয়ে আর কী হবে ? একদিন আগুন দিয়ে বাড়িটা পুড়িয়ে দিলাম !

—নিজের বাড়ি পুড়িয়ে দিলে ? আবার নতুন বাড়ি বানাওনি ?

—বানাবো, বানাবো ! সরকার বাহাদুর যখন এখানে নতুন ব্রিজ বানাবে, তখন আমিও আমার নতুন বাড়ি বানাবো !

আমার আর তাড়াতাড়ি মুর্শিদপুরে ফেরার কথা মনে পড়ে না। আমি লোকটির পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলুম, তা তুমি যে এই মাঝখানটায় বসে

খুঁটির জোড়গুলো কাটছো, তা এটা ভেঙে পড়লে তো তুমিও এটার সঙ্গে ডুববে !

লোকটি হেসে বললো, না, সে আমার হিসেব আছে। এই দ্যাখো না, এখুনি এই এক দিকটা ভাঙবে। এটা গড়বন্দীপুরের দিক। তারপর ওদিকে খানিকটা সরে গিয়ে আবার বাকিটা কেটে ফেলবো। আমার কি ডুবলে চলে, আমাকে দেশে বউ-এর জন্য নতুন বাড়ি বানাতে হবে না ?

—তুমি বুঝি এই পুরোনো ব্রিজের কাঠ দিয়ে তোমার নতুন বাড়ি বানাবে ?

—আরে রাম রাম ছি ছি ! এমন কথা ভাবলে ! তুমি, বাবুদের বাড়ির ছেলে বলেই এই সব কথা তোমাদের মনে আসে। এই কাঠের আর আছে কী ! এতো পচে গেছে ! তাছাড়া, আমাদের গ্রামে সবার মাটি-বাঁশের বাড়ি, সেখানে কি আমি কাঠের বাড়ি হাঁকাতে পারি ? আমার নতুন বাড়িও ঐ মাটি বাঁশেরই হবে। তবে টাইম লাগবে।

—ঐ দেখ, কারা যেন আসছে !

গড়বন্দীপুরের দিক থেকে কারা যেন আসছে ব্রিজের ওপর। দুটি ছায়ামূর্তি। মাথায় কিসের যেন বোঝা।

লোকটি ভয় পেয়ে বললো, আরে, আরে, ওরা মারা পড়বে যে। এই কোথো রোখো এদিকে আর এসো না !

ছায়ামূর্তি দুটি থামলো না, এগোতেই লাগলো।

আমার পাশের লোকটি করাত সরিয়ে রেখে একটা কাঠ প্রাণপণে চেপে ধরলো। আমাকে বললো, ও বাবু, তুমি পাশের খুঁটিটা ধরো। ওরা পা দিলেই ভেঙে পড়বে সব। ছায়ামূর্তি দুটি কাছে এলো একজন নারী ও পুরুষ, তাদের কাঁধে ও মাথায় কয়েকটা পোঁটলা পুঁটলি। আমাদের ঐ রকম অবস্থায় দেখে তারা থমকে দাঁড়ালো।

ব্রিজ ধ্বংসকারী লোকটি বললো, তোমরা পার হতে পারবে না। এই সেতু ভেঙে পড়ছে। খুব বিপদ, তোমরা ফিরে যাও ;

যুবতী মেয়েটি কান্না কান্না গলায়, ওগো আমাদের যে যেতেই হবে !

—না, পারবে না। এই সেতু পার হতে পারবে না।

যুবতীর সঙ্গের পুরুষটি বললো, ওগো, আমাদের যে আর ফিরে যাবার উপায় নেই।

—কেন, ফেরবার উপায় নেই কেন ? যে গ্রাম থেকে এসেছো, আজ রাত্তিরের মতন সেখানে ফিরে যাও ;

পুরুষটি বললো, না গো, সে উপায় থাকলে কি আর বলি। মহাজন আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে। আমাদের ঘর-বাড়ি সব গেছে। একটুকরো জমি ছিল, তাও

ছেড়ে দিয়েছি !

—তা হলে এদিকে কোথায় যাবে ? এদিকে কি তোমাদের কোনো ভরসা আছে ?

—দেখি মুক্তিপুরে কোনো ঠাঁই মেলে কি না !

যুবতীটি বললো, পুরোনো জায়গা ছেড়ে এসেছি, ওখানে আর যাবো না। এদিকে গিয়ে দেখি কী হয়। দু'জনে মিলে খাটবো, আবার ঘর বানাবো ! ওগো, আমাদের যেতে দাও ; ব্রিজ ধ্বংসকারী এবারে শুয়ে পড়ে অনেকগুলি কাঠের মুখ বুকে চেপে ধরলো। তারপর বললো, যাও, তবে সাবধানে যাও ! আমার পিঠের ওপর পা দিতে পারো, তাতে কিছু হবে না। শিগগির চলে যাও, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবো না !

নারী ও পুরুষটি তাকে ডিঙিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। তারপর করাতওয়ালা লোকটি উঠে পড়তেই গড়বন্দীপুরের ব্রিজের অংশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো একসঙ্গে।

আমি এবার তাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই যে তুমি কাণ্ডটি করলে এর পর পারতো গ্রামের লোক মহা অসুবিধেয় পড়বে তুমি জানো। কেউ আর পার হতে পারবে না। তবু তুমি এত কষ্ট করে এই মেয়েটাকে আর লোকটাকে পার হতে দিলে কেন ? ব্রিজ ধ্বংসকারী তার দাড়িওয়ালা মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে এক গাল হেসে বললো, ওরা যে নতুন জায়গায় যাবে, নতুন করে ঘর বাঁধবে, ওদের কথা আলাদা !
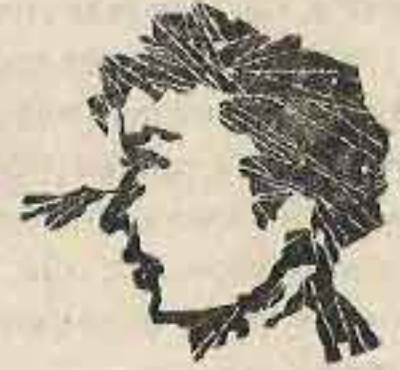
কার্য-কারণ

একজনের খেতে না খেতেই ঘুম পায়, আরেকজনের রাত জাগা অভ্যেস। ঘর একখানাই, দু'দেয়াল ঘেঁষে দুটি নেয়ারের খাট পাতা, মাঝখানের একটা টুলের ওপর হ্যাজাক জ্বলে। একজনের নাক ডাকে, আরেকজন বইখাতা নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

সন্ধ্যের পরই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রায় একই রকম। এখানে চাঁদের আলোতেও জোর নেই। দূরে কাছে কোথাও একবিন্দু আলো চোখে পড়ে না। মাঠের মধ্যে একখানা অস্থায়ী বাড়ি, সামনের দিকে নদীর উঁচু পাড়, তার ওপাশে দেখা যায় না কিছুই। জানলার পাশে একটা বুনো ফুল গাছ, কিন্তু জানলা খোলারও কি উপায় আছে ? অমনি সাঁই সাঁই করে রাশি রাশি মশা আর পোকামাকড় ঢুকে পড়বে ! হ্যাজাকের আলোর লোভে কত বিচিত্র রকমের পোকাই যে আসে। এর মধ্যে অনেক পোকা কুমুদ আগে কখনও দেখেনি।

সন্ধেবেলা গ্রাম থেকে ফিরেই খগেন রান্না চাপিয়ে দেয়। দুপুরের খাওয়ার কোন ঠিক নেই, রাত্তিরের খাওয়াটাই বড় খাওয়া। প্রায় রোজই খিচুড়ি। ভাত আর ডাল আলাদা রান্নার ধৈর্য থাকে না, খিদেও পেয়ে যায় জোর। সঙ্গে আলু-সেদ্ধ বা ডিম সেদ্ধ। মাছ খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু রান্নার বড় ঝামেলা। মাছ জোগাড় করা শক্ত নয়, হাকিম পাড়ার বাওড়ে বাঁধ দেওয়ার কাজ চলছে, সেখানকার জেলেরা মাছ দিতে চায়। প্রথম যেদিন মাছ ওঠে সেদিন তো প্রায় পৌনে এক কেজির একখানা কাৎলা জোর করেই কুমুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ওদের সর্দার। কুমুদ বিনা পয়সায় নেয়নি, ন্যায্য দাম দিয়েছিল। রীতিমত

ওখানকার জেলেদের নিয়ে সমবায় গড়েছে, একটা মাছও যাতে এদিক ওদিক না হয় সেদিকে তার কড়া দৃষ্টি।

সেই কাৎলা মাছ আঁশ ছাড়িয়ে, কুটে রান্না করা কি পুরুষের কাজ। খগো ডেকে এনেছিল গোলাপীকে। গোলাপী গ্রাম সেবিকা, দিনেরবেলা প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হয়। থাকে সে মাইল তিনেক দূরে। দিব্যি রান্নার হাত গোলাপীর, সামান্য মশলা দিয়েই ঝোল আর মুড়োর ঝাল রেঁধে গেলেন।

তারপর থেকে হাজিমপাড়ার বাগ্দীর কাছে গেলেই টুনুন মাছ কিনে আনত। জলজ্যান্ত টাটকা মাছ, তার স্বাদই আলাদা। গোলাপী রান্না করে বাড়িতে এখানেই খেয়ে যায়, খগো কিংবা নীপু তাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসে। এর মধ্যে এক সন্ধেবেলা মণিদা এসে হাজির, পড়িশ বস্তা জিনিসের সঙ্গ নিয়ে। মাছ খেয়ে খুশি হলেন তিনি, সেদিন একটা বেশ বড় মৃগেল পাওয়া গিয়েছিল, গোলাপীকে বললেন, সব ঝোল করিস নি, আগে কয়েকখানা ভাজ, চায়ের সঙ্গে খাব।

সে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া বেশ জমেছিল। গোলাপী চলে যাওয়ার পর মণিদা খগো আর টুনুনকে নিয়ে মিটিং করতে বসলেন দরজা বন্ধ করে। নীপুকে বললেন বাইরে থাকতে।

মণিদার প্রথম বাক্যটাই হল, বৃন্দাবন? তোরা এখানে বৃন্দাবন সাজিয়ে বসেছিস, অ্যাঁ?

মণিদার ধমক খেয়ে খগো আর টুনুন দু'জনেই অবাক। গোলাপীকে ডাকিয়ে এনে মাছ রান্না করানো নাকি দারুণ অন্যায় হয়েছে।

মণিদা যখন কথা বলতে শুরু করেন তখন অন্য কাউকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেন না। একটানা বকাবকি করার পর হঠাৎ একজায়গায় থেমে মণিদা বললেন, দেশলাই আছে কার কাছে? দেখছিস না, সিগারেটটা হাতে নিয়ে বসে আছি, ধরাতে পারছি না?

টুনুন দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না মণিদা, গোলাপীদি আমাদের জন্য মাছ রান্না করে দেওয়ায় কী দোষ হয়েছে? মাছ তো আমরা পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি!

মণিদা বললেন, সেটাও মাথায় ঢুকল না? গ্রামে কাজ করতে আসা মানে কি পিকনিক? গোলাপী রোজ তোদের জন্য মাছ রান্না করে দিচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত এখানে থাকছে, এরপর সবাই বলবে, তোরা এখানে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছিস।

গোলাপীদি প্রায় আমাদের ডবল বয়েসী।

রাতে কিছু যায় আসে না! অত যদি তোর মাছ খাওয়ার লোভ, তাহলে রাত্তিরে এখানে থাকিস কেন? বাড়ি ফিরে গেলেই পারিস? মায়ের হাতের রান্না খাবি!

এই কথা বললেন বটে, অথচ মণিদা নিজেই ওদের জন্য রাত্তিরে থাকার এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নইলে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

খগোর বাড়ি তিনখানা গ্রাম পরে, সে অনায়াসে ফিরে যেতে পারে সন্ধের পর। কিন্তু বাড়িতে তার বিশেষ কেউ নেই তাই বাড়ি ফেরার টান নেই। কিন্তু টুনুনকে বাড়ি ফিরতে হলে সাইকেল নিয়ে যেতে হবে স্টেশনে। সেখানে সাইকেল জমা রেখে ট্রেনে এক ঘণ্টা ধাবমান। সেখান থেকে আবার সাইকেল রিক্সা। রোজ যাওয়া-আসায় অন্তত চার ঘণ্টা সময় লাগে, তার ওপর আবার খরচেরও ব্যাপার আছে।

মণিদা নিজেই উদ্যোগ করে মাঠের মধ্যে এই বাড়িটা বানিয়েছেন। ইটখোলা থেকে ইট চেয়ে এনে বলেছেন, পরে দাম দেব। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে রাস্তার ধারের একটা সুন্দর গাছ কাটিয়ে বানিয়েছেন দরজা-জানলা। মণিদাকে এদিকে অনেকেই মানে, তাঁর দরাজের জোরে কথা বলা শুনে হাসে।

মণিদা ডাক্তার, তিনি আসেন শুধু শনি আর রবিবার। তবে সপ্তাহের মধ্যেও হুট-হাট করে যখন তখন এসে হাজির হন। সেই মাছ খাওয়ার পরের সপ্তাহেই মণিদা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। রাত আটটার সময় একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে উপস্থিত হলেন, হাতে একটা মস্ত বড় ইলিশ মাছ।

বাংলাদেশের মাছ, বুঝলি! স্মাগলড হয়ে এসেছে। স্টেশনের পাশে বিক্রি হচ্ছে দেখে কিনে ফেললুম!

খগো বললো, এই রাত্তিরে এত বড় মাছ নিয়ে কি হবে? গোলাপীকে ডাকা তো নিষেধ!

দ্যাখ না কী হয়। শেষ পর্যন্ত তো একটা টুকরোও পড়ে থাকবে না!

প্যান্ট-কোট ছেড়ে লুঙি পরে মণিদা নিজেই সেই মাছ কুটতে বসলেন। বঁটি নেই, রয়েছে শুধু একটা দা, তাই দিয়েই কাজ চলল। আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে মণিদা বললেন, ইলিশমাছ বলে কথা, একটা সুতো দিয়েও কেটে ফেলা যায়!

মণিদা গোটাদুটি নিজেই মাছ কুটলেন এবং নিজেই ভেজে ফেললেন সব মাছ। টুনুনকে বললেন, গ্রামে থাকতে হলে সব রকমই শিখে নিতে হয়, বুঝলি! মাছ কোটা থেকে রামায়ণ পাঠ! তুই রামায়ণ পড়েছিস। আজকালকার ছেলেরা তো তাও পড়ে না!

রেল-স্টেশন থেকে আসবার পথে মণিদা সাত-আটজনকে নেমন্তন্ন করে

এসেছেন। এল দশ বারোজন। সবাইকেই সেই মাছ খাওয়ানো হল। মণিদা গর্বের সঙ্গে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কেমন রেঁধেছি, বলো অ্যাঁ? কেমন রেঁধেছি? মেয়েরা ভাবে ওদের ছাড়া আমরা ভাল-মন্দ রান্না করে খেতে পারি না!

কুমুদ বুঝতে পারে, মণিদার কাছ থেকে অনেককিছু শেখবার আছে। মণিদা বিলেত ফেরৎ ডাক্তার হয়েও যেমনভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন, সেরকম তো সে পারে না। গ্রামের মানুষের শুধু সাহায্য করার চেষ্টাটাই বড় কথা নয়, আগে তাদের বিশ্বাস অর্জন করা দরকার।

রাত্তিরে মণিদা যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, কুমুদ তখন একটা দু'বছরের পুরনো মোটা ডাইরি খুলে লিখতে বসে। কলেজে পড়ার সময় আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের দেখাদেখি কুমুদও কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। একটা দেয়াল পত্রিকার সহ-সম্পাদকও হয়েছিল। প্রত্যেকদিন চার-পাঁচটা কবিতা লিখে ফেলত, ছাপার অক্ষরে দু'তিনটে বেরিয়ে গেল। তারপর ওদের কলেজের একটি সাহিত্যসভায় একদিন একজন নাম করা কবিকে ডেকে আনা হল। কুমুদ লাজুকতা কাটিয়ে সেই কবির কাছে গিয়ে বলেছিল, স্যার, আপনি আমার জন্য কিছুটা সময় দিতে পারবেন? আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা দরকার আছে।

নাম করা কবি কুমুদের দিকে কয়েক পলক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমাকে স্যার বলছ কেন, আমি কি তোমার মাস্টারমশাই? যে কোন রোববার চলে এসো আমার বাড়ি, সকাল নটা থেকে এগারোটার মধ্যে। তার আগেও না, পরেও না। তখন তোমার ব্যক্তিগত কথা শুনব।

ঠিক পরের রবিবারই সাড়ে নটার সময় সেই কবির বাড়িতে হাজির হয়েছিল কুমুদ। বসবার ঘরে আরও দু'তিনজন উপস্থিত। সেই কবি কুমুদকে দেখে চিনতেও পারলেন না, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

কুমুদ বলেছিল, আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমাদের কলেজে গত বৃহস্পতিবার—

কবির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল। তিনি বললেন, ও, হ্যাঁ, তোমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে আমার সঙ্গে...বলে ফেল।

কুমুদ সঙ্কুচিত বোধ করছিল। অন্য লোকজনের সামনে...।

ভেতর থেকে চা এল তিন কাপ। কবি আরও দুটি খালি কাপ চেয়ে নিয়ে সেই চা সবাইকে ভাগ করে দিলেন। কুমুদের দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, প্রথম আলাপেই ব্যক্তিগত কথা বলা খুবই শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু এর পরে আরও বেশি লোক আসতে পারে, আর এগারোটার সময় আমি বেরিয়ে

যাব। সুতরাং তুমি পরে তো আর সময় পাবে না।

কাঁধের ঝোলা থেকে কুমুদ বার করেছিল একটা খাতা। মৃদু গলায় বলেছিল, জানি আপনার সময় নষ্ট করছি। আমি কিছু কবিতা লিখেছি, জানি না, এগুলো কবিতা হয়েছে কিনা। বন্ধুরা লিটল ম্যাগাজিন বার করে, তাতে দু'একটা ছাপা হয়। কিন্তু আপনার কাছ থেকে মতামত চাই, আপনি যদি দয়া করে একটু পড়ে দেখেন!

কবি খাতাটি নিয়ে প্রথম কবিতাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। দু-তিনবার। পরের কবিতাগুলি দু'তিন লাইন পড়েই পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। তারপর খাতাটি বন্ধ করে কুমুদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে রইলেন।

ঘরের অন্যরাও চুপ। একটু বাদে একজন বলে উঠল, জামতাড়ায় আমি একটা বাড়ি যোগাড় করতে পারি।

কবি হাত উঁচু করে তাকে থামতে বলে কুমুদের দিকে ফিরে বললেন, দেখ, আমি উপদেশ দেওয়া পছন্দ করি না। ব্যক্তিগত মতামত জানাতে পারি শুধু। আমার মতামতেরও কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। তুমি কবিতা লিখবে কিনা সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। আমার মত হচ্ছে, তোমার এই লেখাগুলি ঠিক কবিতা হয়নি। তুমি এই যে লিখেছ, এ বছর আর তিনপুলে মধু আসবে না। কারণ মৌমাছিরা উধাও, আর এক জায়গায় লিখেছ, মালবিকাকে আমি রোজ দেখি না, কারণ আমার ধৈর্য কম। দেখা যাচ্ছে কার্য-কারণ খোঁজার দিকে তোমার একটা ঝোঁক আছে। কিন্তু কবিতা তো যুক্তি-তর্কের মামলা নয়। কবিতা অনেকটা স্বপ্নের মতন...। তুমি কবিতার বদলে বরং প্রবন্ধ লেখ।

পৌনে এগারোটায় বেরিয়ে এসেছিল কুমুদ, মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় কবিকে আর ততটা প্রিয় লাগছিল না, মনে পড়ছিল সেই কবির নানান দুর্বলতার কথা।

তার পরেও বছরখানেক সে কবিতা লেখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল, ছাপাও হচ্ছিল দু'একটা করে। ফাইনাল পরীক্ষার আগে সেই উৎসাহ অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছিল। মালবিকাদের বাড়ি, তাদের পারিবারিক সংস্কৃতি, প্রচুর নাম করা লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ দেখে কুমুদ বুঝতে পেরেছিল সে মালবিকার ঠিক যোগ্য নয়। বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে তাকে দুঃখ পেতে হবে।

কবির একটা কথা তার মনে লেগে গিয়েছিল। কুমুদের কার্য-কারণ খোঁজার দিকে ঝোঁক আছে, এটা সে নিজেই অস্বীকার করতে পারে না। সে-হিসেবী। কল্পনায় সে নিজেকে কখনো ছেড়ে দিতে পারে না।

কুমুদের আর কবিতা লেখা হয়নি, প্রবন্ধ লেখাতেও সে হাত দেয়নি।

গ্র্যাজুয়েশানের পরেই কুমুদের চাকরি খোঁজার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দাদা একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধ বাবার রোজগারে সংসার চলতে চায় না। ছোট বোনটার বিয়ে দিতে হবে।

রেজাল্ট ভাল হয়নি, সুতরাং ভাল চাকরির আশাও কম। এই অবস্থায় স্কুল-মাস্টারিই একমাত্র ভরসা। চতুর্দিকে দরখাস্ত পাঠাচ্ছে কুমুদ, কয়েক জায়গায় ইন্টারভিউ দেবার পর সে বুঝলো যে আজকাল ইস্কুল মাস্টারির জন্যও কোনো না কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের ছাতার নিচে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার।

এই সময় দাদার বন্ধু মণিদাই একদিন বললেন, এই, তুই তো বেকার বসে আছিস। গ্রামে গিয়ে কাজ করবি আমার সঙ্গে? কিছু হাত খরচ পাবি, কিন্তু খাটতে হবে খুব। জল-কাদা মাখতে হবে, মাঝে মাঝে এক আধবেলা খাবার জুটবে না...।

দাদার বন্ধু হিসেবে মণিদা ওদের বাড়িতে দু একবার বাবা-মাকে চিকিৎসা করতে এসেছেন। একটু পাগলাটে ধরনের মানুষ। বেশি জোরে জোরে কথা বলেন। মণিদার চেম্বারে গিয়েও কুমুদ দেখেছে, সেখানে বহু মানুষের ভিড়, অনেকেই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে এসেছে। মণিদা প্রায়ই গ্রামে সমাজ সেবা করতে যান সেকথাও কুমুদ শুনেছিল।

মণিদার প্রস্তাবে কুমুদ রাজি হয়ে গেল। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা কাজ করা অনেক ভালো। কাজ করতে এসে দেখলো, পরিশ্রম আছে বটে, কিন্তু এ কাজে আনন্দও আছে।

চৌদ্দখানা গ্রাম নিয়ে প্রজেক্ট। খুবই অনুন্নত এলাকা। এদিককার জমিতে ফসল ভালো হয় না, গ্রামের মানুষের কোনো রকম রোজগারই নেই। কী করে এরা বেঁচে থাকে সেটাই রহস্য। কেউ কেউ বছরের কয়েক মাস দিন মজুরির কাজ পায়, বাকি সময়টা বেকার।

কেউ কেউ চুরি-ডাকাতি করে। এদের স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য দু'বছরের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, টাকা দিচ্ছে একটি বিদেশি সংস্থা। কিছু সরকারি সাহায্যও আছে।

অল্প দিনের মধ্যেই কুমুদ এই কাজে বেশ মেতে উঠলো। নিছক চাকরি তো নয়, দেশের কাজ। চতুর্দিকেই তো এখন দলাদলি, মারামারি, এর মধ্যেও যদি কিছু দুর্ভাগা মানুষকে অন্তত বাঁচার একটা পথ দেখানো যায়, তাতে কিছুটা আত্মপ্রসাদ আসে। প্রথম যেদিন ভোলাডাঙ্গায় কুমুদরা এক পাল শুয়োর নিয়ে গিয়েছিল।

ভোলাডাঙ্গার সবাই নিম্ন বর্ণের মানুষ, অতি গরিব। সে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে এক জোড়া করে শুয়োর-শুয়োরী দেওয়া হয়েছে। শূকর পালনের নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। কুমুদ নিজেই এ ব্যাপারে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ব্যারাকপুর থেকে। শুয়োর একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা দেয়। তারা যে কোনো জিনিস খায়। বাচ্চাগুলোকে একটু বড় করতে পারলেই বিক্রি করে বেশ লাভ হয়। এই ভাবে সারা [illegible] গ্রামের মানুষের একটা আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে।

সব গ্রামে একই ব্যবস্থা নয়। মুসলমান প্রধান গ্রামে শুয়োর দেওয়া যায় না, সেখানে দেওয়া হচ্ছে গাই-ছাগল। কিংবা মুর্গী। এ ছাড়া সব গ্রামের মহিলাদেরই দেওয়া হচ্ছে 'ধান ভেনে চাল দাও' কাজ। প্রত্যেক বাড়িতে দু'বস্তা করে ধান দেওয়া হবে, বাড়ির মেয়েরা সেই ধান সেদ্ধ করে, শুকিয়ে, ঢেঁকিতে ভেনে চাল ফেরৎ দেবে। একটা নয়, চার ভাগের তিন ভাগ। জুন-জুলাই মাসে চালের দাম সব চেয়ে বেশি ওঠে, সেই সময় গ্রামের মানুষরাই ন্যায্য দামে ঐ চাল কিনবে সোসাইটির কাছ থেকে।

রাত জেগে মোটা ডাইরিতে কুমুদ কবিতা লেখে না, তার সারা দিনের কাজের নোট রাখে। কোন কাজে কী ভুল হলো, তার কার্য-কারণ খোঁজে।

ভোলাডাঙ্গায় তাদের প্রজেক্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সেই দিনটার কথা মনে পড়লে কুমুদের এখনো বুক কাঁপে।

সন্ধের পর কুমুদরা কেউ গ্রামে থাকে না, কিন্তু সেদিন থাকতে হয়েছিল। একজন সরকারি ইন্সপেক্টরের আসবার কথা। তিনি অন্যান্য গ্রাম ঘুরে সময় দিয়েছিলেন ভোলাডাঙ্গায় আসবেন সাড়ে পাঁচটার সময়। প্রীতিময় আর কুমুদ গ্রামের সর্দারের বাড়িতে বসে সরকারি কর্মচারিটির জন্য অপেক্ষা করছিল। বিকেল থেকেই বৃষ্টি নামলো, সে বৃষ্টি থামলো, ঘণ্টা বাদে। এর মধ্যে সরকারি কর্মচারিটি যদি না আসতে পারেন সেজন্য তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। সাইকেল ছাড়া এ গ্রামে আসবার আর কোনো উপায় নেই, এত জল কাদার মধ্যে সাইকেলও চলে না।

প্রীতিময় আর কুমুদ তাদের সাইকেল দুটো ঠেলতে ঠেলতে ফিরছিল অন্ধকারের মধ্যে। দুজনেই নিঃশব্দ। এমন সময় শুনতে পেল ঢোলের শব্দ। গ্রামের একেবারে একটেরে একটা বাড়ি, সে বাড়ির উঠোনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর কারা যেন ঢোল বাজাচ্ছে। কুমুদ আর প্রীতিময় প্রায় ছুটতে ছুটতেই হাজির হলো সেখানে।

একটুক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সে বাড়িতে একটা শুয়োর

খাওয়া হয়েছে। খানিকটা মাংস বেচে সেই পয়সায় কেনা হয়েছে চুল্লু, বাকি মাংস ঝলসানো হচ্ছে আগুনে। সে বাড়িতে তিনজন নারী-পুরুষ, আরও দুজন জুটেছে কোথা থেকে, চুল্লু খেয়ে এরই মধ্যে তারা ঘোর মাতাল।

মাতাল বলেই ওদের মধ্যে কোন অপরাধ বোধ নেই। শুয়োর মেরেছি, বেশ করেছি! আমাদের দিয়ে দিয়েছিল তো, নিজের টাকাতে তো কিনে দিসনি, সরকারি টাকায়। আমাদের জিনিস আমরা কাটব, বেচব, যা খুশি করব।

এ বাড়ির একটা মেয়ের নাম রুইয়া। কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছে, তাই বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে। রোগা-ভোগা চেহারা, কোনদিন তাকে দর্শনীয় মনে হয়নি। সেদিন চুল্লু খেয়ে তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। মাথার সব চুল পাগলিনীর মতন এলো, বুকের আঁচলের ঠিক নেই। কাঠের আগুনে তাকে দেখাচ্ছে যেন ডাকিনীর মতন। কুসুমের একটা হাত চেপে ধরে সে টানতে টানতে নিয়ে এল আগুনের পাশে। এক টুকরো মাংস তুলে ধরে বলল, খা, খা! তুমি তো বাবু, আমাদের হাতের মাংস খাবি না? খা! খা!

কুসুমের একেবারে মুখের সামনে রুইয়ার মুখ, তার হাতখানা রুইয়ার বুকের ওপর চেপে ধরা। সে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অন্য সবাই হা হা করে হাসছে। কুসুমের মনে হয়েছিল রুইয়া তাকে কামড়ে দেবে। সে অসহায় ভাবে তাকিয়েছিল প্রীতিময়ের দিকে।

প্রীতিময় এখানকার পুরনো কর্মী, অনেক বেশি অভিজ্ঞ। সে এগিয়ে এসে এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে বলেছিল, ইস, নুন দিসনি কেন? নুন ছাড়া মাংস কেউ খায় কী করে?

নিজে সেই মাংস খেয়ে সে কুসুমকেও সেই মাংস খাইয়েছিল।

সেদিন ফেরার পথে প্রীতিময় বলেছিল, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে না রে কুসুম! আমরা শুধু ওদের পেটের খিদের কথাই ভাবি, কিন্তু ওদের যে একটা উৎসবেরও ক্ষুধা আছে, সেটা কি অস্বীকার করা যায়? ওদেরও তো ইচ্ছে হয় বছরে অন্তত বেশি করে রান্না হবে, নাচ গান হবে....।

ভোলাডাঙার একে একে সব পরিবারই তাদের শুয়োরগুলো বাচ্চা হবার আগেই বেচে দিল কিংবা কেটে খেয়ে ফেলল।

যাদের হাঁস-মুর্গী দেওয়া হয়েছিল, তাদের অবস্থাও একই। যাদের ধান দেওয়া হয়েছিল, তারা দাম ফেরৎ দেয় না। দেখা করতে গেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

কুসুম কিছুতেই বুঝতে পারে না, এরা এদের ভবিষ্যতের কথা বুঝতে পারে না কেন? আগেও তো এরা না খেয়েই থাকত। ক'টা দিন একটু বেশি খেয়ে

কিংবা মাংস-টাংস খেয়ে এরা একটা স্থায়ী উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিল!

তবু হাল ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এখন প্রত্যেক পরিবারকে আলাদা ভাবে কিছু জিনিসপত্র না দিয়ে গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ গড়া হচ্ছে। গ্রামের মানুষদের এখন যৌথ দায়িত্ব নিতে শেখানো দরকার।

সেই রুইয়া নামের মেয়েটা এখন আবার আগের মতন সাধারণ হয়ে গেছে। কুসুমের সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ সেই সন্ধেবেলা তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। রুইয়াকে দেখলেই তার সেই সন্ধেবেলার রূপটা মনে পড়ে।

গৃহপালিত শুয়োরটাকে হঠাৎ একদিন কেটে ফেলে, তার মাংস ঝলসে খেতে খেতে, অর্থাৎ নিজেদের সর্বনাশ করার মুহূর্তেই রুইয়াকে কেন অত উজ্জ্বল ও অপরূপ দেখাচ্ছিল? কুসুম কিছুতেই এর কার্য-কারণ খুঁজে পায় না, তাই তার অসহায় লাগে।

হাতঘড়িতে কুসুম দেখল, রাত সাড়ে এগারোটা। এবারে বাতিটা নিভিয়ে দিলেই হয়। বাইরে কিসের যেন খচর-মচর শব্দ। প্রথম প্রথম এরকম শব্দ শুনলেই কুসুম দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারত। দু'একটা শেয়াল চোখে পড়েছে। খগেন অবশ্য বারণ করে, গভীর রাত্রে দরজা খুলবে না। একলা অন্ধকারের দিকে তাকালে মানুষ কত কী দেখে ভয় পেতে পারে।

কাল ভোরবেলা বাওড়ের কাছে যেতে হবে গম নিয়ে। ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য বেশ কিছু গম এসেছে তাদের কাছে। সারাদিন বাওড়ের বাঁধ বাঁধার কাজের জন্য মাথাপিছু আড়াই কেজি গম দেওয়া হয়। এই কাজ পাওয়ার জন্য সবাই লোলুপ। এক একটা গ্রামের লোকদের ভাগ ভাগ করে প্রতিদিনের কাজ চালানো হচ্ছে। প্রীতিময়ের মাথা ঠাণ্ডা, সে এই সব সামাল দিতে পারে, তার বিলি-বন্দোবস্তে কেউ চটে যায় না।

একটা জিনিস কুসুম বুঝতে পারে, গ্রামের মানুষ তাদের ভালবাসতে শুরু করেছে। ওরা নিজেদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়। এক একদিন চুল্লু খেয়ে খুব হৈ-হল্লা করলেও পরের দিন খুব নরম হয়ে যায়। দারিদ্র্যের মধ্যেও কেউ নিজের গাছের একটা পাকা পেঁপে কিংবা একটা দুটো এঁচোড় উপহার দিতে চায়।

আলোটা নিভিয়ে দেবার পর কুসুমের সবে চোখ জুড়িয়ে এসেছে এমন সময় বেশ জোরে শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। শেয়াল কি বারান্দায় উঠে এসেছে? গমের বস্তা আছে, সেই গন্ধে গন্ধে আসতে পারে।

আর একবার শব্দ হতেই কুসুম বেশ চমকে উঠল। এতো শেয়ালের শব্দ নয়। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই।

কুমুদ চেঁচিয়ে উঠল, কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল, তোর বাপ!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দম দম লাথি পড়তে লাগল।

খগোকে আর ডাকতে হল না। তার নাক ডাকা থেমে গেল, সে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল, কে? কী হয়েছে? কিসের শব্দ?

বাইরে থেকে একজন বলল, দরজা খুলবি না আগুন লাগিয়ে দেব?

খগো কাঁপতে কাঁপতে বলল, ডাকাত পড়েছে গো! আজ শেষ হয়ে গেলাম! একেবারে খতম করে দেবে!

ডাকাত? কুমুদ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার যুক্তিবাদী মন মানতেই চাইছে না যে কাছাকাছি কোন গ্রামের মানুষ তাদের ওপর ডাকাতি করতে পারে! দূর গ্রাম থেকেও তো ডাকাতরা সব খোঁজ খবর নিয়ে আসে। তাদের কাছে আছে কী? প্রায় বছরখানেক হল তারা এই মাঠের মধ্যে আস্তানা গেড়ে আছে। গ্রামে সব কথাই জানাজানি হয়ে যায়। সবাই জানে তারা দু'জন সমাজসেবক এখানে রাত কাটায়, তাদের সম্বল হরলাজ।

কুমুদেরও ভয় করছে খুবই। তার শরীর কাঁপছে। তবু সে গলার আওয়াজ সহজ করার চেষ্টা করে বলল, কে আপনারা? শুধু আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমরা কী দোষ করেছি?

বাইরে লোকের সংখ্যা অন্তত তিনজন। তাদের মধ্যে একজন একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে উঠল। আর একজন বলল, দরজা খোল, সাইকেল দুটো বার করে দে!

সাইকেলের লোভে এসেছে। প্রজেক্ট থেকে প্রত্যেক কর্মীকে একটা করে সাইকেল দেওয়া হয়েছে, সাইকেল ছাড়া ঠুঁটো জগন্নাথ। এদিকে কোন পাকা রাস্তা নেই। সাইকেল ছাড়া পনেরোটি গ্রাম ঘোরাঘুরি করা অসম্ভব! দরজার ওপর শাবল বা ঐ রকম কিছু দিয়ে ঘা মারছে বাইরে থেকে। সাধারণ দরজা ঐ আঘাত আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?

খগো বলল, দরজা খুলে দাও গো! নইলে কেটে কুচি কুচি করবে!

খগো গ্রামের মানুষ তবু তারই ভয় বেশি। কুমুদই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ওরা।

ওদের একজনের হাতে টর্চ। অন্ধকারে ওদের মুখ প্রায় দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় মুখে কাপড় বাঁধা। পরিচয় গোপন করতে চাইছে। ওরা যে গলায় কথা বলছে সেটা ওদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয়। অর্থাৎ ওরা জানে, খগো বা কুমুদ ওদের চিনে ফেলতে পারে।

দু'জনের বিছানা থেকে চাদর দুটো তুলে নিয়ে ওরা খগো আর কুমুদকে সেই চাদর দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল। বাঁধার সময় পাশে একজন শাবল তুলে ধরে থেকে বলল, টুঁ শব্দটি করবি তো মাথা দু'ফাঁক করে দেব।

সাইকেল দুটো ঘরেই রাখা হয়। খগোর সাইকেলে আবার তালা দেওয়া। খগো একটু শৌখিন, সে তার সাইকেলে অন্য কারুকে হাত দিতে দেয় না। রোজ সন্ধেবেলা সে তার সাইকেল ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে।

খগোর সাইকেলটা নাড়াতে না পেরে একজন বলল, চাবি দে, শুয়োরের পুত!

খগো বলল, বালিশের নিচে!

কুমুদের ভয় চলে গেছে। গভীর দুঃখে ভরে গেছে তার বুক। সে বুঝতে পেরেছে যে এরা কাছাকাছি গ্রামেরই লোক। এরা জানে না কুমুদরা কত কষ্ট করে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে? দেশ স্বাধীন হবার এতগুলো বছর পরেও এই গ্রামগুলোর সামান্য একটুও উন্নতি হয়নি, বরং আরও যেন অবনতি হয়েছে। যারা দেশ চালায় তারা এইসব গ্রামের কোন খবরই রাখে না। কুমুদরা তবু তো কিছুটা চেষ্টা করছে, তা কি এরা বোঝে না?

কুমুদ বলল, আপনারা চান না আমরা গ্রামে কাজ করি? আপনারা কি চান আমরা এখান থেকে চলে যাই?

খগো বলল, দাদা, চুপ করো।

একজন ডাকাত কুমুদের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বলল, বেশ কটর-কটর কাড়ছিল। জানে মরতে চান?

সাইকেল দুটো বার করার পর ওরা গমের বস্তায় হাত দিল। গ্রামের মানুষের জন্যই এই গম, গ্রামের মানুষই তা চুরি করছে। এই গম ওরা খেতে পারবে না, কেন না, কারুর বাড়িতে এত গম জমা দেখলে প্রতিবেশীরাই সন্দেহ করবে। এই গম ওরা রাতারাতি বিক্রি করে দেবে। চোরাই গম কেনার জন্য মহাজনের অভাব নেই। পঁচিশ বস্তার মধ্যে দশটা বস্তা বার করে নিল ওরা। কুমুদ এক এক করে গুনছে। দশটা বস্তা পাচার হবার পর একজনকে বলল, আর থাক।

তাই নিয়ে ডাকাতদের মধ্যে সামান্য মতভেদ হল। কিন্তু তা মিটেও গেল সহজে। আর দুটি মাত্র বস্তা টেনে বার করে ওরা বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট, দু মিনিট, দশ মিনিট – ওরা আর ফিরে এল না। ওরা চলেই গেছে তাহলে। বাকি বস্তাগুলো রেখে গেল কেন? নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে।

রাত্তিরে দীনুর এখানে পাহারা দেবার কথা। নাইট-গার্ড হিসেবে সে মাইনে পায়। কিন্তু দীনু কোনো রাতেই থাকে না। পাশের গ্রামে তার বাড়ি, সে

খাওয়া-দাওয়ার পরে বসে যায়। কুমুদ কোনোদিন আপত্তিও করেনি। পাহারা দেবার প্রয়োজনও তো বোধ করে নি আগে।

ভোর হতে না হতেই চলে আসে। ততক্ষণ তাদের হাত বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে হবে?

খগো বলল, বড় জোর প্রাণে বেঁচে গিইছি। এ তল্লাটের ডাকাতরা সাক্ষী রেখে যায় না।

কুমুদ জিজ্ঞেস করল, যারা এসেছিল চিনতে পারলি?

ওরে বাবা, আমি চেনবো কী করে? তুমি চেনার চেষ্টাও করো না। তাতে আরও বিপদ হবে!

কুমুদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। যারা নিজেদের ভালো বোঝে না তাদের ভালো কি অন্য কেউ করতে পারে? গ্রামের মানুষ তাদের চায় না। এর পর কী আর প্রজেক্ট চলবে? চালাবারই বা কী মানে হয়?

আবার পায়ের শব্দ। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো দুজন। ফিরে এসেছে, বাকি গমের বস্তাগুলো নিতে এসেছে।

ওরা ঘরে ঢুকে খগো আর কুমুদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। একজন বলল, চাঁচামেচি করো না, শুয়ে পড়ো। অনেক খারাপ কথা বলিছি, দোষ নিও না। তোমরা ভালো লোক জানি, গরিবদের দুঃখ বোঝো। কিন্তু আমাদের যে বড় বিপদ!

অভিমানে কুমুদের গলায় বাষ্প জমে গেল। ডাকাতি করার পর এ আবার কী আদিখ্যেতা! তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুলো না।

লোকটি বলল, ধান কাটার জন্য রোজে খাটতে গেসলুম, দারোগা শালা আমাদের নামে ডাকাতির কেস লিখিয়ে দিয়েছে। জন্মে কখনো চুরি ডাকাতি করিনি, বিশ্বাস করুন। এখন থানার লোকদের টাকা না খাওয়ালে খাটকে ভরে দেবে! কী করি বলুন দেখি? টাকা পাই কোথায়? কালকের মধ্যেই কিছু না করতে পারলে একেবারে জেহলার ভরে দেবে...

লোকগুলো চলে যাবার পর খগো বললো, ওরে বাপরে, আমি আর থাকতে থাকছিনি! আগামী হপ্তায় নাকি এক গাড়ি গুঁড়ো দুধ দেবে, কে তা পাহারা দেবে?

কুমুদ তবু কোনো কথা বলতে পারছে না। তার সব কিছু গুলিয়ে গেছে। সে কার্য-কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না!

সোনামণির অশ্রু

লোকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন!

রোগা-পাতলা, লম্বাটে চেহারা, বছর চল্লিশেক বয়েস। মাথার চুল বেশ ঘন, তার মধ্যে দু'চারটে সাদা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, লোকটির মুখখানা অনেকটা ঘোড়ার মতন। তা বলে খারাপ দেখতে বা হাস্যকর কিছু নয়, অনেক মানুষের মুখই এরকম হয়। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট পরা, তার পোশাক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, বাঁ হাতে একটা সোনার আংটি।

লোকটি জগুবাবুর বাজারের বাইরের ফুটপাত থেকে দুপুর দেড়টার সময় তালশাঁস কিনছে। দুপুর দেড়টা।

রাস্তার অনেক মানুষের মধ্যে সাধারণ একটি মানুষ। একে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই যে ঐ লোকটি একটি খুনী।

খুনীরা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তালশাঁস কেনে? টাকায় সাতটা দেবে না আটটা, তাই নিয়ে দরাদরি করে?

দু'টাকায় পনেরোটিতে রফা হলো। লোকটি কাগজের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগলো হাজরার মোড়ের দিকে।

কালিকা সিনেমার এক পাশের একটা তিনতলা বাড়ির দরজায় তিনটি চিঠির বাক্স। লোকটি দেখলো মাঝখানের বাক্সটি ফাঁকা।

দোতলায় আলো হাওয়া যুক্ত স্বতন্ত্র তিন কামরার ফ্ল্যাট। পনেরো বছর আগেকার ভাড়া। বেশ সস্তা। সল্টলেকে জমি হয়েছে তার, কিন্তু বাড়ি করার উৎসাহ নেই, দোকান থেকে অনেক দূর পড়ে যায়।

লোকটির স্ত্রী বাংলা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। ঘড়িটার দিকে পড়ল, দুপুরে তা পড়ে না। এই তো একটু আগে স্নান সেরে এসেছে, দুপুরবেলা

এই সময় প্রত্যেকদিন তার স্বামী দোকানে অন্য কর্মচারী বসিয়ে রেখে বাড়িতে ভাত খেতে আসে।

ওদের ছেলেটিই বড়, এই সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর মেয়ে ছোট, ন'বছর মাত্র বয়েস, স্কুল থেকে সেও ফিরেছে একটু আগে।

দরজার বেল শুনে মাসিক পত্রিকাটি মুড়ে রেখে স্ত্রী বললো, খুকি দোর খুলে দে, বাবা এসেছে!

এক বুড়ি এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে, তিনদিন ধরে সে বেপাত্তা। গৃহকর্ত্রীকেই আজ খাবার গরম করতে হবে, আর গোটা কয়েক বেগুন ভাজা। একটা কিছু ভাজাভুজি না করলে ওর স্বামীর মুখে ভাত রোচে না।

খাট থেকে নেমে তখুনি সে রান্না ঘরের দিকে না গিয়ে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়ালো। গুমোট গরম, দু'চারটি ঘামাচি হয়েছে তার বুকে, বাঁ হাত দিয়ে নিজের বাম স্তনটি চেপে ধরে সে ডান হাত দিয়ে ঘামাচি মারতে লাগলো।

মেয়ে দরজা খুলে বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, কী এনেছো? কী এনেছো?

ঠোঙাটি মেয়ের হাতে দিয়ে লোকটি তার গাল টিপে একটু আদর করলো। তারপর ঢুকলো শয়ন ঘরে।

রক্ত মাংসের স্ত্রীর শরীরের চেয়েও আয়নায় আধো উন্মুক্ত বেশ বড় একটি বর্তুল স্তন তাকে মুগ্ধ করলো বেশি। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

দেয়ালে কালী ঠাকুরের ছবি, তাতে কাগজের লাল ফুলের মালা। ড্রেসিং টেবলের দু'পাশে দুটি বাঁকুড়ার ঘোড়া। জানলায় একটি পুরোনো বিলিতি মদের বোতলে মানি প্ল্যান্ট।

সুখী বাড়ি।

সেলিমপুরের এ পাশটা থেকে বড় রাস্তা পেরুলেই যোধপুর পার্ক। খানিকটা ভেতরে ঢুকলেই সোনামণির মাসীর বাড়ি।

সোনামণির মা আর বাবা দু'জনেই অফিসে যান, ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায় বলে সোনামণি ইস্কুল থেকে ফিরেই মাসীর বাড়িতে চলে যায়। বাড়ির ঝি তাকে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়।

সোনামণির বয়েস এগারো। গল্পের বই-এর জগত ছেড়ে সে এখনো বাস্তব পৃথিবীতে পা দেয়নি। এইবার বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, শারদেয় সৌন্দর্যে তার মুখখানা অপরূপ, খুব বাচ্চা বয়েস থেকেই লোকে তাকে দেখলে বলতো, ইস্, একেবারে পুতুলের মতন দেখতে হয়েছে মেয়েটা। এক এক সময় এই কথা শুনলে সে ধড়ফড় করে কেঁদে ফেলতো। সবাই এক কথা বলে,

তার মোটেই পুতুল হতে ইচ্ছে করে না।

এখন সোনামণিকে কেউ কেউ আদর করে বলে আকাশের পরী। সে সবে মাত্র লম্বা হতে শুরু করেছে, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় কাজল টানা। পড়াশুনোতেও সোনামণির তীক্ষ্ণ মেধা।

সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা বাজে, সোনামণি মাসীর বাড়ির থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছে। খানিক আগেই লোডশেডিং হয়েছে, রাস্তাঘাট একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেলে প্রবল তোড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় এখানে সেখানে জমে আছে কালো জল।

বাড়ির দাসী বিমলা সোনামণির হাত ধরে ধরে হাঁটছিল, কিন্তু সোনামণি নিজেই মাঝে মাঝে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আর অত ছোট নেই। আর দু'দিন বাদেই তার জন্মদিন। তখন সে বারোতে পা দিয়ে সতেরোর জগতেও পা রেখে।

এত অন্ধকারেও রাস্তায় মানুষজন কম নেই। হেড লাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তারই মধ্যে সাইকেল রিক্সা, একটা গরু…।

ফুটপাথ থেকে যত রাস্তায় নামতেই খানিকটা জল। সোনামণি সেখানে পা দেওয়া মাত্র কেউ যেন তাকে নিচে টানলো জল থেকে। সোনামণি হাত বাড়িয়ে বিমলাকে ধরতে গেল, পারলো না। চিৎকার করতে গেল, পারলো না।

রাস্তায় হাঁটু ডোবার চেয়েও কম জলে সোনামণি ডুবে গেল।

বিমলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। কোনো গাড়ির হেডলাইটে সে এক পলকের জন্য সোনামণির গায়ের সাদা ফ্রকটাকে দুমড়ে নিচে পড়ে যেতে দেখলো।

ও খুকু কোথায় গেলে? ও খুকু! কী হলো গো? ও খুকু!

বিমলা হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল জলে, কিন্তু সে ডুবলো না। এবং সে জানতেও পারলো না তারই গোড়ালির ধাক্কায় সোনামণি আবার ডুবে গেল খোলা হাইড্রান্টের মধ্যে। একবার সে কোনো ক্রমে ভেসে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

বিমলার চ্যাঁচামেচির কারণটা রাস্তার লোকদের বুঝতেই অনেকটা সময় লাগলো। সবাই তিতি বিরক্ত, কে আর অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়?

আড়াই ঘণ্টা বাদে নরকের পাঁক মাখা সোনামণির মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। যাক, তখনও ঝিমঝিমে অন্ধকার রাস্তায়, কেউ তার বিকৃত বীভৎস মুখখানা দেখতে পায়নি।

রাত পৌনে একটা। এ সময় শহর প্রায় ঘুমন্ত হলেও কেউ কেউ জেগে থাকে।

পঞ্চাননতলা বস্তীর পাশে রেল লাইনের ওপারেই জনা পাঁচেক যুবক আড্ডা জমিয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের এখনো গোঁফ গজায়নি, তবু তারা টেনেটুনে যুবকদের দলে ঢুকতে চাইছে।

সামনে বাংলা মদের বোতল, আর ঝাল ঝাল কিমার চাট। চারজনের মুখে সিগারেট, একজন গাঁজা পাকাচ্ছে।

রাতের দিকে দু'একটা মাল গাড়ি চলে মাঝে মাঝে। তাও ইদানীং বেশ কমে গেছে। মাল গাড়ি এলে ওদের কাজ কারবার ভালো হয়। কিছুদিন ধরে বাজার মন্দা যাচ্ছে তাই ছ্যাঁচড়া কাজ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ একজন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!

আর একজন তার উরুতে একটা থাবড়া মেরে বললো, চুপ বে! চেল্লাসনি! বস্ত চড়ে গেছে?

প্রথম ছেলেটি তবু আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বললো, ঐ-ঐ-ঐ, ঐ যে ভাখ! ভূ-ভূ-ভূত!

এবারে পাঁচজনেই দেখতে পেল। ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফুটফুটে ফর্সা, এগারো-বারো বছরের একটি পরী তাদের সামনে শূন্যে ভাসছে।

পাঁচজনে একেবারে থ। চোখের ভুল নয়, সত্যি দেখছে।

পরীটি খুব মিনতিপূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, ওগো, তোমরা আমায় মারলে কেন? আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে?

পাঁচ যুবকের শরীরে কাঁপুনি ধরলো এবার। যেন পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে কলার চেপে ধরেছে। এবারে ফাঁসী দেবে। এরা তো ছুরি-ছোরা বা পেটো-পিস্তলের কারবার করে না। সে জন্য অন্য দল আছে। এরা তো শুধু মাত্র ছোটখাটো মাল সরাবার কাজে হাত পাকাচ্ছে।

বিনা নির্বাচনেই এদের যে দলপতি, সেই গণা বললো, তোমায় কে মেরেছে? আমরা তো কোনো মেয়েছেলের গায়ে হাত দিই না? তুমি ভুল জায়গায় এসেছো!

কিশোরী পরী বললো, হ্যাঁ, তোমরাই মেরেছো। কেন মারলে, বলো, কেন মারলে? আমি কী দোষ করেছি? আমার বাবা-মা কি তোমাদের কাছে কোনো দোষ করেছে?

গণা বললো, আরে কী মুস্কিল, সত্যি বলছি, আমরা ওসব কাজ করি না। তোমাকে আমরা মারিনি।

কিশোরী পরী বললো, আর দু'দিন বাদে আমার জন্মদিন। আর হলো না। আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না। মা-বাবা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওগো, তোমরা কেন আমায় এই শাস্তি দিলে। তোমরা যোধপুর পার্কের সামনে রাস্তার তিনটে হাইড্র্যান্টের লোহার ঢাকা খুলে নিয়েছো…

গণা এবারে চোখ বুজলো। পুলিশ যেন চোরাই মাল তুলে ধরে তার চোখের সামনে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ও কাজটা তাদেরই বটে।

এবারে দ্বিতীয় নেতা নেবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছে। সে বললো, হ্যাঁ, নিয়েছি। পেটের দায়ে। তুমি যোধপুরে থাকতে, তোমরা বড়লোক, গাড়ি করে যাও, তোমাদের নর্দমায় পা দেবার কথা নয়!

সোনামণি বললো, আমাদের গাড়ি নেই। আমি বিমলার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, নর্দমায় পড়ে গিয়ে ডুবে গেছি, বিমলার পা ভেঙে গেল…ওগো, তোমাদের কি একটুও দয়া নেই?

গণা বললো, আজ শালা সন্ধ্যেবেলা হেভি বৃষ্টি হয়েছে!

নেবু বললো, বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমেছে সে তো শালা ভগবানের দোষ!

গণা সোনামণির উদ্দেশে বললো, তুমি দয়ার কথা বলছো; আমরা যখন খেতে পাই না, তখন কেউ দয়া করে? তোমার বাপ-মা কি আমাদের খেতে দেবে? কোনো শালা খেতে দেব না। কিছু চাইতে গেলে দূর দূর করে খেদিয়ে দেব!

—তোমরা অন্য কাজ করতে পারো না? বড়রা যেমন অফিসে কাজ করে—

—হাঃ! তুমি কোথাকার পরী গো? কিছু জানো না। শুধুমুধু আমাদের দোষ দিতে এসেছো? অন্য কাজ, হেঃ। নন্তেদা বেহালায় কারখানায় কাজ করতো, তার চাকরি গেছে। এখন সেও আমাদের লাইনে ঢুকেছে।

—ছিঃ, তা বলে তোমরা খারাপ কাজ করবে? যাতে মানুষ মরে?

—আবার ঐ কথা বলছো! তুমি যে মরেছো, সে জন্য যদি কেউ দায়ী হয়, তা হলে সে হলো অশুবাবুর বাজারের শিববাবু!

—সে কে?

—তার লোহার দোকান। সে আমাদের কাছ থেকে মাল কেনে। পার্কের রেলিং ভেঙে নিয়ে গেলে কম দর দেয়। নর্দমার ঢাকনা নিয়ে গেলে ভালো পয়সা। একখানা নিয়ে গেলে বলে আর মাল নেই?

—হ্যাঁ গো পরী, তোমার মৃত্যুর জন্য শিববাবু দায়ী! ও মাল যদি সে না কিনতো, তাহলে কি আমরা এমনি এমনি খুলতুম? সেই শিববাবু শালা আবার

খুব কালী ভক্ত। দোকানে অ্যাও বড় ছবিটা!

সোনামণির আত্মা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালিকা সিনেমার পাশে দোতলার ফ্ল্যাটে শিববাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

স্বামী স্ত্রীর ডবল খাট, ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘরে বিছানা। কিন্তু মেয়েটা বড় বাবার ভক্ত, প্রায়ই নিজের বিছানা ছেড়ে বাবা-মায়ের মাঝখানে শুয়ে পড়ে।

শিববাবু চোখ মেলে আঁতকে উঠলো প্রথমটা।

জানলা দিয়ে ধোঁয়ার মতন কী যেন ঢুকছে। তারপর সেই ধোঁয়া একটি মূর্তি নিল। একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে, গায়ে সাদা ফ্রক, সে হাওয়ায় ভাসছে!

শিববাবু ভাবলেন, কোনো দেবতা বুঝি এসেছে তার ঘরে। লক্ষ্মী ঠাকরুণ? একটা লটারির টিকিট কিনেছে সে, যদি দু'কোটি দু'লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজটা লেগে যায়…

ভাসমান পরী দুঃখের সুরে বললো, ওগো, তুমি আমায় মারলে কেন? আমি কী দোষ করেছি তোমার কাছে?

—অ্যাঁ?

শিববাবু আঁতকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কুল কুল করে ঘাম বইতে লাগলো তার শরীরে। এই মেয়েটা খুন হয়েছে? বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কথা! এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না শয়তান?

কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এসেছে কেন? তার নামে অভিযোগ করছে? এ কি আশ্চর্য কথা!

—ওগো, তুমি কেন আমায় মারলে? আর দু'দিন পরে আমার জন্মদিন—

—এ কী কথা বলছো, মা? আমি কেন তোমায় মারবো? আমি বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করি, আমি তো খুন-জখমের ব্যাপারে থাকি না। তোমারই বয়েসী মেয়ে আছে আমার—

—কেন, রেললাইনের কাছে লোকগুলো যে বললো, তুমি আমাকে মেরেছো?

—রেল লাইনের পাশের লোক? তারা কারা? আমি তো চিনি না। তোমার কী হয়েছিল, খুলে বলো তো?

—আমি যোধপুর পার্ক থেকে আসছিলুম, সন্ধেবেলা লোডশেডিং ছিল, রাস্তায় জল ছিল।

—ও হ্যাঁ, রেডিও'র খবরের খবরে শুনলুম বটে, ওদিকে একটি মেয়ে রাস্তার দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহা গো! এমন কাঁচা বয়েসের মেয়ে, ছি-ছি-ছি, গাড়ি চাপা দিয়েছিল?

—রাস্তার নিচে পাতাল থাকে, আমি সেখানে ডুবে গেছি। পাতালের ঢাকনা ছিল না।

—কী বললে, পাতাল?

—রেল লাইনের লোকেরা বললে, তুমি সেই পাতালের ঢাকনা কেনো, তাই ওরা সেগুলো তুলে আনে। তুমি না কিনলে ওরা আনতো না।

—ও, এবার বুঝেছি! ওরা বাজে কথা বলেছে। আমি না কিনলে ওরা অন্য কারুর কাছে বেচতো। আমি দোকান খুলেছি, কেউ পুরোনো লোহা আনলেই কিনি। সে কোথা থেকে এনেছে তা আমার দেখার দরকার কী?

—তুমি জানো না, ওগুলো খুলে নিলে মানুষ মরে যেতে পারে? যেমন আমি মরে গেলাম? আমি কি দোষ করেছি যে এমনি করে আমাকে মরতে হবে?

—তুমি শুধু শুধু আমার দোষ দিচ্ছো মা। জানো, ঐ লোহার ঢাকনাগুলো আমার কাছ থেকে কে কেনে? কর্পোরেশনেরই অফিসার। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসায়, গলা-নেবুরা সেগুলো আবার তুলে আনে, কর্পোরেশনের অফিসার আবার কিনতে আসে আমার কাছে। এর মধ্যে আমি কে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কর্পোরেশনের মিঃ দাস, তার কাছে যাও। সে তো জেনে শুনেই এসব করাচ্ছে!

—তুমিও তো জানতে?

—আমি অত শত চিন্তা করি না। আমি মাল কিনি, মাল বেচি। রাস্তা রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমার নয়। পুলিশ এই চুরি বন্ধ করতে পারে না? পুলিশ ইচ্ছে করে ওদের ধরে না, বুঝলে? ওখানকার থানায় ও সি-কে গিয়ে বলো, সে তোমাকে মেরেছে। আর যারা রোজ সন্ধেবেলা লোডশেডিং করে? তারা জানে না যে রাস্তায় এত গর্ত, কত নর্দমার ঢাকনা নেই, সারা সন্ধে অন্ধকার থাকলে কত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। হচ্ছেও তো রোজই। তারা দোষ স্বীকার করেছে কখনো? তুমি তাদের কাছে যাও। আগে গিয়ে, তারা সবাই এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে। তুমি একলা আমাকে দুষতে এসেছো কেন, মা? আহা, তোমার মতন একটা মেয়ে…

সোনামণি আবার ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

শিববাবুর বুক কাঁপছে। হাত জোড় করে সে প্রণাম জানালো ঠাকুরের উদ্দেশে।

তারপর পাশের ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে স্নেহের হাত রাখলো।

তখুনি সে ঠিক করলো, খুকিকে সে কোনোদিন সন্ধ্যের পর রাস্তায় বেরুতে দেবে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের আকাশে দুলতে লাগলো সোনামণির আত্মা।

শিববাবু নামের লোকটি কতগুলো লোকের নাম বললো। সে এখন কোথায় যাবে, কার কাছে তার দুঃখের কথা জানাবে। তার জন্মদিন আর হবে না। সে আর এই পৃথিবীতে বড়দের জগতে পা দিতে পারবে না।

এত বড় শহরের তো কিছুই চেনে না সোনামণি। শিববাবু যাদের নাম বললো, তাদেরকে এখন কোথায় খুঁজে পাবে?

ঢেউ-এর মতন অভিমান ঝাপটা দিতে লাগলো তার বুকে। রাত্রির শিশিরের মতন টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে লাগলো তার চোখের জল।

সার্থকতা

বুকের কাছে দু'হাত জোড় করে মহিলাটি বললেন, নমস্কার, কেমন আছেন? চিনতে পারেন?

অভ্যাসবশতই আধো-হেসে বাসুদেব বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভালো তো? অনেকদিন পর দেখা।

তিনি মহিলাটির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে নিজের বুকের ছবিঘরে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। মশাল জ্বেলেও এখন পুরোটা দেখা যায় না। কিছুটা অন্ধকার থেকেই যায়। সম্পূর্ণ অচেনা মুখ, টলটলে দুটি ঠোঁট, অচেনা-অচেনা চোখ দুটিতে মৃদু হাসি মাখা। অনেকের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মতন মুখ ও শরীর, কিন্তু যৌবন একেবারে ঝুঁকে এসেছে শেষ প্রান্তে, রূপ যাই যাই শব্দ তুলেছে।

মহিলাটি চিবুক উঁচু করে বললেন, চিনতে পারেন নি তো? আমার কিন্তু ঠিক মনে আছে। আচ্ছা—

অন্য ঢেউ আসে, মহিলাটি দূরে সরে যান। হলঘরটিতে পঁচিশ-তিরিশজন নারী-পুরুষ। এঁদের অনেককেই বাসুদেব চেনেন না, তিনি দীর্ঘকাল বোম্বাই প্রবাসী। আজকের আপ্যায়নকর্তা তাঁর এক বন্ধুর বন্ধু। কয়েক রকম সুরা আছে, নরম পানীয়, খানা-খাজনা আছে। কলকাতা হিসেবে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বোম্বাই-দিল্লি-মাদ্রাজ সব জায়গাতেই আজকাল এই একই রকম পার্টি হয়। মেয়েদের নানারকম সাজপোশাক দেখা যায়, পুরুষদের নানারকম রসিকতায় যোগ দিতে হয়।

বাসুদেবের মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল। কে ঐ মহিলাটি? অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও বাসুদেব ওকেই খুঁজছেন, দূরে দু'একবার চোখাচোখি

হতেই মহিলাটি আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর ভুরুতে অভ্রবিন্দুর মতন ঝিকমিক করছে কৌতুক।

আগে অচেনা লোকজনের মধ্যে বাসুদেব খুব লাজুক হয়ে পড়তেন। চেহারা ছিল রোগা পাতলা, সব সময়েই যেন থাকতেন আড়ালে। কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারতেন না। এখন চেহারা বদলে গেছে অনেক, বেশ ভারিক্কি হয়েছেন, কিছুটা মেদ আসায় মুখের খাঁজগুলো ভরাট হয়ে গিয়ে সৌম্য ভাব এসেছে। তাছাড়া সার্থকতাও এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। কলকাতা ছেড়ে বম্বের নতুন পরিবেশে গিয়ে মানিয়ে নিতে প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাজের সুনামের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে যেচে এসে খাতির করতে লাগলো তাঁকে।

অনেকদিন পর কলকাতায় এসে বোঝা যায় চেনাগুলো মানুষেরা বদলে যাচ্ছে। শুধু নিজের বদলটাই চোখে পড়ে না। সিদ্ধার্থর স্ত্রী রুমা একসময় খুব চুপচাপ স্বভাবের ছিল, কথা না বলে শুধু মৃদু মৃদু হাসতো, সেই রুমা কী রকম জোরে জোরে হাসছে। ব্যবহারে ঝকঝকে ভাব। অথচ তার মুখের চেহারায় আগেকার ঔজ্জ্বল্য নেই।

হাসতে হাসতে রুমা একবার বাসুদেবের কাছে এসে বললো, কী বাসুদা, আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন? আসুন, সবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

এইসব পার্টির নিয়ম, ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলা। বাসুদেবের এখনো এটা রপ্ত হয়নি। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, হয়েছে, অনেকের সঙ্গে।

রুমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো, আপনি বোম্বাইতে ফ্ল্যাট কিনেছেন? আপনার তো এখন খুব নাম, গত রবিবার টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ছবি ছাপা হয়েছিল আপনার।

বাসুদেব রীতিমতন অবাক হলেন। দাতের পাতায় এক কলম একটা অস্পষ্ট ছবি ছাপা হয়েছিল, তাও বোম্বের কাগজে। এখানে বাসুদেব সেকথা তো কারুকে বলেননি।

—তুমি জানলে কী করে?

—আমরা কলকাতায় বসে বুঝি বোম্বের খবর রাখিনা? আপনারা, বোম্বের লোকেরা মনে করেন, কলকাতাটা একটা পাড়াগ্রাম।

—না, না, না, সেকথা বলছি না। আমি বোম্বের লোক নই। বোম্বের লোক তো কলকাতার কাগজ পড়ে না, তাই আমি ভাবছিলুম বোম্বের কাগজ এখানে ···

—আমি লাইব্রেরিতে কাজ করি, সেখানে অনেকরকম কাগজ আসে। দেখলুম, আপনি কী একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এর আগে সানডে ট্রিবিউনে কাগজেও

আপনার সম্পর্কে লেখা পড়েছি। আমাদের কত গর্ব হয়!

রুমা যে চাকরি করে সে খবরই বাসুদেবের জানা ছিল না। আগে মনে হতো, রুমা বিশেষ পড়াশুনোর ধার ধারে না। জীবনের বাঁকে বাঁকে কতো বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। একটু আগে রুমার তীক্ষ্ণ হাসি তাঁর খারাপ লাগছিল, এখন রুমাকে বেশ পছন্দ হলো।

—বাসুদা, আমি সামনের মাসে বোম্বে যাবো একবার। আপনার ওখানে উঠতে পারি?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সিদ্ধার্থর সঙ্গে একটু আগে কথা হলো, কই, ও তো বম্বে যাবার কথা কিছু বললো না?

ও তো যাবে না। আমি একলা যাবো।

বাসুদেব একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। পুরনো ধারণা থেকে তিনি মনে করেছিলেন রুমা সব সময় তার স্বামীর সঙ্গেই বাইরে যায়। রুমাকে তিনি বোম্বাইয়ের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন, কিন্তু রুমা কি জানে না যে সেখানে তিনি একা থাকেন?

দূরের মহিলাটির দিকে বাসুদেব আর একবার তাকালেন। একবার ভাবলেন রুমাকে জিজ্ঞেস করবেন এ মহিলার পরিচয়। কিন্তু করলেন না। এক মহিলার কাছে অন্য মহিলার প্রসঙ্গ তোলা সব সময় নিরাপদ নয়। কী জানি ওদের মধ্যে কী রকম সম্পর্ক।

রুমা অবশ্য আর সুযোগও দিল না, সে বাসুদেবের হাত ধরে টেনে আর একজন সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এরকম চশমা আজকাল পুরুষ মানুষদের চোখে দেখা যায় না। তবে ভদ্রলোক ভালো সেতার বাজান শুনে বাসুদেব নিশ্চিন্ত হলেন। যারা প্রকাশ্য মঞ্চে অনুষ্ঠান করে, তাদের সাজপোশাক একটু অন্যরকম হয়ই। ঐ ভদ্রলোকের মতন সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি পরার কথা বাসুদেব কল্পনাও করতে পারেন না।

সেই মহিলাটি একজন কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছেন। বাসুদেব রুমা ও সেতার বাদকের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে যেতে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনবার চেষ্টা করলেন। যদি দু' একটা টুকরো থেকে পরিচয়ের কোন সূত্র পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না, রহস্যময়ী মহিলাটি বলছেন কালিম্পং-এর কথা, সিমলিয়েই ঘুরে এসেছেন সেখান থেকে। ক্যামেলিয়া ফুলের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। কালিম্পং? বাসুদেব কখনো যাননি।

একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, অথচ কিছুই মনে পড়ছে না, এটা বড় কষ্টের। ওঁর নামটাও জিজ্ঞেস করা হয়নি। উনি হাসিমুখে সেতারে

'কেমন আছেন' বললেন, তারপর আর নাম জিজ্ঞেস করা যায় না।

এবারে একজন কেউ গান গাইবেন। কলরব প্রথমে গুঞ্জনে পরিণত হলো, তারপর ঝিলমিল নীরবতা। গায়কটিকে বেশ বিখ্যাত মনে হলো, অনেকের মুখ উদগ্রীব, শুধু সেতার-বাদকটির মুখে চাপা অবজ্ঞার ভাব। তিনি হয়তো সেতার আনেন নি, তাঁকে শ্রোতার ভূমিকা দিতে হবে। গায়কটি চোখে সুর্মা দিয়েছেন মনে হচ্ছে, ডান হাতের আঙুলে তিনটে আংটি, এখন হারমোনিয়াম নিয়ে পোঁ পোঁ করছেন।

শুভাশিস গায়কের পাশ থেকে চেঁচিয়ে বললো, বাসু, তুমি একেবারে পেছনে বসে আছো কেন? সামনে এসো, তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিই।

বাসুদেব হাত তুলে বললেন, ঠিক আছে। পরে—।

শুভাশিসের সঙ্গেই তিনি এখানে এসেছেন। ও বড্ড বেশি কথা বলে, অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ। বাসুদেবের সম্পর্কে লোকজনের কাছে এমন পরিচয় দিতে শুরু করে যে তাঁর লজ্জায় মাথা নুয়ে যায়।

হাতের সিগারেটটা ফেলবার জন্য অ্যাশট্রে খুঁজতে খুঁজতে বাসুদেব সেই মহিলাটির কাছে চলে এলেন। এঁর সঙ্গে কোনো পুরুষ নেই, বাসুদেব এতক্ষণ লক্ষ করে তা বুঝেছেন।

বাসুদেব হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন কোথায় থাকেন?

মহিলাটি বাসুদেবের চোখে চোখ রেখে বললেন, অর্থাৎ আমার নামটা এখনো মনে পড়ে নি তো? আমি বলবো না, ভুলেই গেছেন যখন—

—খুব চেনা চেনা লাগছে।

—মিথ্যে কথা! আমার চেহারা বদলে গেছে। সবাই বলে আজকাল। আমার কিন্তু আপনার কথা ঠিক মনে আছে। তখন ধুতি, পাঞ্জাবি পরতেন, চঞ্চলদাদের বাড়ির আড্ডায় এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতেন। ঠিক বলছি কি না?

—চঞ্চলদের বাড়ি?

গান শুরু হতেই কথা থামিয়ে দিতে হলো। মহিলাটি ইচ্ছে করে বাসুদেবের পাশ থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে সেই কিশোরী মেয়েটির পাশে বসলেন।

চঞ্চলদের বাড়ির কথা শুনেই সব মনে পড়ে গেছে বাসুদেবের। অনেকদিন আগেকার কথা, চোদ্দ-পনেরো বছর তো হবেই। এই সেই দুর্বিনীত তরুণী, মূর্তিমতী অহংকার? চেহারা অনেক বদলেছে ঠিকই, যেমন, বাসুদেবেরও বদলেছে, কিন্তু মুখের রেখা ও চাহনির ঝিলিক তো সেই একই রকম। নাম মনে পড়ে নি, কারণ, ওর কোনো নামই ছিল না। অনামিকা কোনো মেয়ের নাম হয়?

অনামিকা দত্ত চৌধুরী! শুভোজ্জ্বল দত্ত চৌধুরীর স্ত্রী, সেই শুভোজ্জ্বল, যিনি এশিয়ান গেমসে পরপর দু'বার ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। অত নামকরা খেলোয়াড়, অথচ ছিলেন নিপাট ভালোমানুষ, খুবই নম্র আর বিনীত। অনামিকাও তো রাইফেল শুটিং-এ অংশ নিয়েছে, নিজেই সে দিন যেন রাইফেলের কার্তুজ!

চঞ্চলদের বাড়ির আড্ডা, প্রত্যেক শনিবার, তুমুল এলাহি, রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত। সেখানে সবাই খ্যাতিমান, অথবা বড়-চাকুরে। বাসুদেব তখন একটা কলেজে ফিজিক্সের সামান্য লেকচারার, নেহাত চঞ্চল তার বালাবন্ধু বলেই সেই আড্ডায় সে স্থান পেত। চঞ্চলই তাকে নিয়ে যেত জোর করে। অত সব নামকরা লোকজনের মাঝখানে বাসুদেব হীনমন্যতায় ভুগতো, তা ছাড়া নিজের গোটানো স্বভাবের জন্য সে সহজভাবে মিশতেও পারতো না।

অনেকেই স্ত্রীদের নিয়ে আসতেন সেই আড্ডায়, কেউ কেউ বান্ধবীকেও, সেইসব মহিলাকুলের মধ্যে এই অনামিকা ছিল একটি আগুনের গোলা। তার সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই চলতো না। হাসি-ঠাট্টা, গান, তাসখেলা, মদ্যপান, নাচ কোনোটাতেই তার জুড়ি ছিল না কেউ।

বাসুদেবের সঙ্গে অনামিকার কোনোদিনই ভালো করে আলাপ হয়নি। কোনোদিন তিনি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একটি বাক্য বিনিময় করেছেন কিনা সন্দেহ, বাসুদেব ছিলেন পিছনের সারির মানুষ, তিনি দূর থেকে দেখতেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, অনামিকার মতন নারীরা বাসুদেব মজুমদারের মতন মানুষের গ্রন্থে কোনোদিনই আসবে না। ওরা অন্য বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়।

তবু বাসুদেবের আকাঙ্ক্ষা ছিল, গভীর দুঃখবোধ ছিল। অনামিকাকে তিনি নিজের মতন করে চেয়েছিলেন, সে অন্যরকম চাওয়া। পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করার স্বভাব ছিল না তাঁর। ছেলেবেলা থেকেই বই-পত্রের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাননি। অনামিকার অহংকার, ছটফটানি, আর সবকিছুর মধ্যেই একটা চমৎকার সারল্য ছিল। কেউ কোনো মিথ্যে কথা বললে অনামিকা দারুণ বিস্ময়ের শব্দ করে উঠতো। কেউ আড়ালে অন্য কারুর নিন্দে করলে অনামিকা খাঁটি ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠতো, ছিঃ এসব কী! অনামিকার ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বাঁ হাতে মদের গেলাস, তবু কোনো রকম অরুচিকর কথাবার্তা শুনলে তার মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়তো, সে বলতো, আমি কিন্তু তাহলে আর এখানে থাকবো না। তোমরা আনন্দ করতে জানো না, খারাপ কথা বলো কেন?

অনামিকার সারল্যের সামনে অনেকেও বিশুদ্ধ হয়ে উঠতো। এই সারল্যের

সঙ্গে রূপ মিশে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাসুদেব চেয়েছিলেন সেই মাধুর্যের ভাগ নিতে। শারীরিক স্পর্শ নয়, শুধু মাধুর্যের ছোঁয়া। অনামিকা তার সামনে এসে বসবে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলবে, কোথাও কিছু হারাবে না, কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম পাওয়া হয় নি। অত্যন্ত চৌখস পুরুষরাই সব সময় অনামিকার সামনে থেকেছে, বাসুদেব পড়ে থেকেছেন পেছনের সারিতে। অনামিকার চোখে চোখ ফেলতেও পারেন নি ভালো করে। সেজন্য অবশ্য অনামিকাকে দোষ দেওয়া যায় না।

শুধু চঞ্চলের বাড়িতেই নয়, অন্য যে-কোনো জায়গায় গেলেই অনামিকার ঐ মাধুর্যের জন্য তৃষ্ণাটা জেগে উঠতো বাসুদেবের মনে। অন্য নারীদের সঙ্গে সে অনামিকার তুলনা করতো মনে মনে। যেখানে মানুষ সবচেয়ে একা থাকে, সেই নাথরুমে বসে সে ধ্যান করতো অনামিকার।

সর্বভারতীয় একটি বিজ্ঞান-মেধা প্রতিযোগিতায় একটি যন্ত্রের মডেল পাঠিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন বাসুদেব, পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই সুবাদে বসে থেকে ভালো চাকরির আমন্ত্রণ। তারপর কলকাতা ত্যাগ। তারপর ব্যস্ত জীবন। চার বছর বাদে একবার চঞ্চলের বাড়িতে এসে দেখেছিলেন আড্ডা ভেঙে গেছে। চঞ্চল ট্রান্সফার হয়ে গেছে দুর্গাপুরে।

সবেতে প্রথম গিয়ে সমুদ্র দেখেও অনামিকার কথা মনে হয়েছিল। সব সৌন্দর্যের মধ্যেই একটা মিল থাকে। সমুদ্রকে যেমন কেউ নিজের বাড়ির চৌবাচ্চায় আনতে চায় না, সেই রকমই বাসুদেব অনামিকাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নিয়ে আসতে চাননি। শুধু তার রূপের মাধুর্যই তিনি ছেঁকে নিতে চেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে চলে আসার পর অনামিকার মুখচ্ছবি যেন বেশি ঝকঝক করতো তাঁর মনে। অনেক দুঃখ, অনেক ব্যর্থতার মুহূর্তে ঐ মুখ মনে করে তিনি শান্তি পেয়েছেন।

তারপর আস্তে আস্তে দুঃখ কমতে লাগলো। ব্যর্থতার বদলে একে একে দেখা দিতে লাগলো সার্থকতা। বাসুদেব মজুমদার টমাস এডিসনের মতন আবিষ্কারক নন বটে, কিন্তু ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বেশ সার্থকই বলতে হবে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি মৌলিক যন্ত্রের মডেল তিনি তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটিয়েছেন নিজের দেশের। আর এই সার্থকতার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সৌন্দর্যতৃষ্ণা। অনামিকা কবে যে মন থেকে হারিয়ে গেছে তিনি খেয়ালই করেন নি? এই সেই অনামিকা! যাকে দেখলেই এক সময় বুক কেঁপে উঠতো, আজ তাকে দেখে তিনি চিনতেই পারলেন না।

বাসুদেব কোনোদিন অনামিকার চোখেই পড়েননি, অথচ অনামিকা তাঁকে মনে রেখেছে কী করে? অনামিকা তাঁকে লক্ষ করতো তা হলে? অনামিকার মনে তাঁর জন্য একটু স্থান ছিল? ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সাধারণ একজন কলেজের লেকচারার, যে মেয়েদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতেই জানতো না, তাকে অনামিকার মনে থাকবে কীজন্য?

এবারে এক ঝলক মনে পড়লো, সুশোভন দত্ত চৌধুরীর কী যেন একটা অ্যাকসিডেন্টের খবর তিনি পড়েছিলেন খবরের কাগজে। বেঁচে আছে না মরে গেছে?

এসব কথা কি এখন জিজ্ঞেস করা যায়? তিনি চিনতে পারেন নি বলে অনামিকা কি অপমান বোধ করে চলে গেল এখান থেকে? বাসুদেব একবার ভাবলেন উঠে গিয়ে অনামিকার খোঁজ করবেন। কিন্তু উঠলেন না, তাঁর ভয় করছে, তাঁর বুক কাঁপছে। তিনি বসেই রইলেন মুখ নিচু করে।

উত্তরপুরুষ

সকালবেলা খাবার টেবিলে সেঁকা পাউরুটি আসবার পর দেখা গেল মাখন নেই। রান্নাবান্না সব বামুনদিদিই করেন, কিন্তু স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খাবার নিজের হাতে পরিবেশন করেন সুমিত্রা। স্বামী ও মেয়ে দু'জনেই টেবিলের দুই প্রান্তে খবরের কাগজ ও ইংরেজি গল্পের বই পড়ায় ব্যস্ত, ছেলে এখনো আসেনি, তাকে অনেক ডাকাডাকি, সাধাসাধি করে খাবার টেবিলে আনতে হয়।

মাখন লাগাবার ছুরি আর সেঁকা রুটি হাতে নিয়ে সুমিত্রা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রত্নেশের চোখ খবরের কাগজে সাঁটা। সুমিত্রা অভিযোগের গলায় বললেন, মাখন নেই, তোমায় জ্যাম মাখিয়ে দেব?

কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে রত্নেশ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সুমিত্রা আবার বললেন, মাখন ফুরিয়ে গেছে!

রত্নেশ বললেন, আমাকে শুকনো টোস্ট দাও!

সুমিত্রা অন্য রুটিগুলোতে জ্যাম মাখাতে মন দিলেন। একটু পরে মাথা তুলে আবার বললেন, বাড়িতে পেঁয়াজও ফুরিয়ে গেছে!

রত্নেশ বললেন, তাতে কী হয়েছে? পেঁয়াজ ছাড়া রান্না হয় না?

— পেঁয়াজ ছাড়া মাংস, তুমি খেতে পারবে?

হঠাৎ রত্নেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমরা সামান্য জিনিস নিয়ে আমাকে এত বিরক্ত কর কেন বলো তো?

কফির কাপটা হাতে নিয়ে রত্নেশ চলে গেলেন শোবার ঘরে। তের বছরের মেয়ে মিলি এইসব কথার মধ্যেও একবারও বই থেকে চোখ তুলল না।

খাবার ঘরটিতে এই দিনের বেলাতেও আলো জ্বালা। বাইরের দিকের সব

কটি জানালা বন্ধ।

সুমিত্রা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, রাজা, রাজা, খাবি আয়!

এক ডাকে রাজাকে কখনো পাওয়া যায় না, তার খোঁজে ভাইকে পাঠাতে হয়। কিন্তু ভাই নেই। ভাইয়ের কথা মনে পড়তেই সুমিত্রার মুখে দুঃখ আর রাগ একসঙ্গে মিশে গেল। মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়?

সুমিত্রা আপন মনেই বললেন, থাক, না খেয়ে থাক। আমি আর ডাকব না!

মিলি এবার বইটা সরিয়ে রাখল। মায়ের গলা অন্যরকম। এই রকম মেজাজ দেখলে সে ভয় পায়। সে উঠে গেল ছোট ভাইকে ডাকতে।

রাজা তখন ছাদের সিঁড়িতে হুটোপুটি করছে। ছাদের দরজায় তালা বন্ধ। মস্ত বড় ছাদ, রাজাকে তার খেলার জায়গা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ বাড়ির কেউ যেন বাইরে উঁকি মারতে না পারে সেইরকম ব্যবস্থা।

রাজা একটা কাগজের মুখোশ পরে অরণ্যদেব সেজেছে, সে অবশ্য অরণ্যদেব নামটি জানে না, সে বলে ফ্যান্টম। তার দু'হাতে দুটি পিস্তল-পিচকিরি, রেলিং-এর ওপর বসে সে বিপজ্জনক ভাবে ঘোড়া চালাচ্ছে। দিদিকে দেখেই সে ঢিস্টা, ডিশুম ডিশুম শব্দে দুটি পিস্তল খালি করে দিল।

রাজাকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে আনতে হল খাবার ঘরে। তার অফুরন্ত জীবনী-শক্তির জন্য যেন খাদ্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। খাওয়াটা তার প্রতি তার মায়ের একটা অত্যাচার। টোস্টে মাখন আছে কি নেই তা সে গ্রাহ্যই করল না, কচমচ করে কামড়ে খেতে লাগল, দুধের গেলাসে একটু চুমুক দিল, সামনের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বলল, আমি ডিম খাব না, কিছুতেই খাব না।

সেটা সে একটু বেশি জোরে ঠেলে দিয়েছিল, সেদ্ধ ডিমটা গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সুমিত্রা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, তুই...তুই ডিমটা ফেলে দিলি? অসভ্য ছেলে!

ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মারলেন রাজার গালে। তারপরও বললেন, তুমি বড্ড বেড়ে গেছ, তাই না? দিন দিন আনম্যানেজেবল হয়ে উঠছ?

রাজা হাঁ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। মিলির অবস্থাও তাই। সুমিত্রা ছেলের গায়ে হাত তুলেছেন, এ দৃশ্য এ বাড়িতে অকল্পনীয়।

সেদ্ধ ডিমটা পড়েছে রাজার চটির ওপর। সুমিত্রা সেটা তুলে নিয়ে একবার ভাবলেন ধুয়ে নেবেন কি না, তারপর সেটা আবার ফেলে দিলেন ট্র্যাশ ক্যানে।

সুমিত্রা ধরা গলায় বললেন, যখন কিছু খেতে পাবি না, তখন বুঝবি!

মিলি উঠে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। সে বুঝেছে যে গুরুতর কিছু ঘটতে

যাচ্ছে। সে বলল, মা, ঐ লোকগুলো যাবে না?

সুমিত্রা বললেন, না। ওরা যাবে না! আগে আমাদের শেষ করে দেবে, তারপর—

—বাপি কেন পুলিশ ডেকে ওদের সরিয়ে দিচ্ছে না?

—সে তোর বাপিকেই জিজ্ঞেস কর! কী যে জেদ!

রাজা এই সুযোগে একটা দৌড় মেরে চলে গেল তার খেলার জায়গায়। গেলাসের দুধটা তৃতীয় চুমুকে শেষ করতে গিয়ে তার ঠোঁটে সাদা গোঁফ আঁকা হয়ে গেছে।

একতলায় রত্নেশের পিসতুতো ভাই অনুপ থাকে সস্ত্রীক, তাদের আলাদা বাসা। অনুপ চাকরি করত পাটনায়, বছর দেড় বছর আগে রত্নেশ তাকে নিজের কারখানার ম্যানেজার করে নিয়ে এসেছেন। অনুপ কাজের ব্যাপারে খুব দক্ষ হলেও তার ব্যবহার রুক্ষ। গোড়া থেকেই ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি।

নিজের লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা অনুপ সিঁড়ি দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, সেজদা কোথায়? ঘুমোচ্ছে এখনও?

সুমিত্রা মাথা দু'দিকে নেড়ে শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

—বৌদি, চা বানাচ্ছ নাকি? আর এক কাপ হতে পারে?

—দিচ্ছি!

—এ কী বৌদি, তোমার চোখে জল? তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ? আরে, এরকম তো হয়ই।

—তিনদিন কেটে গেল, ওরা কি আমাদের উপোস করিয়ে মারবে?

—তোমার পতিদেবতাটি যে শুনছেন না! নইলে আমি সব ঠিক করে দিতাম। দাঁড়াও, আজ আবার দেখি রাজী করাতে পারি কি না।

এগিয়ে গিয়ে সে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কয়েকবার খটখট করল। তারপর বিরক্তির সঙ্গে রিসিভারটা আবার নামিয়ে রেখে সে বলল, ধুৎ! টোন নেই। ফোনটা এমনিই খারাপ হয়ে গেল না ওরা লাইন কেটে দিল তাও তো বোঝা যাচ্ছে না!

শোবার ঘরেরও সবকটা জানালা বন্ধ। আলো জ্বলছে। রত্নেশ একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মুখটা নিচু করা। এই তিনদিনেই রত্নেশের চোখের নিচে কালির দাগের ছাপ পড়েছে, তার দৃষ্টিও বিভ্রান্ত।

অনুপ ঘরে ঢুকে বলল, সেজদা, লেবার কমিশনারের সঙ্গে আর একবার গিয়ে দেখা করি? আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না। আমি গিয়ে পড়লে ঠিকই দেখা হবে।

রত্নেশ মুখ তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন অনুপের দিকে। যেন তিনি কোনো দুর্বোধ্য ভাষা শুনছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, নীনার কাল জ্বর হয়েছে শুনলুম। এখন কেমন আছে?

অনুপ এই ধরনের অবান্তর কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বলল, ও সাধারণ জ্বর—ফ্লু। ভাববার কিছু নেই। তাহলে যাব লেবার কমিশনারের কাছে?

—কী করে যাবি তুই?

—আমি বেরুতে চাইলে ঠিকই বেরুতে পারি। আমাকে আটকাক তো দেখি ওদের কত সাহস।

—তুই একটা গণ্ডগোল পাকাতে চাস, তা হলে আমাদের আরও বেশি ক্ষতি। তুই ওদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে গেলে ওরা বলবে আমরা ওদের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছি।

—তুমি পুলিশে খবর দিতে চাইছ না কেন বলতো? তোমার বন্ধু মিঃ জালান তো আছেন!

—ফোন ডেড, কী করে পুলিশকে খবর দেব!

—তার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ছাদ থেকে পাশের বাড়িতে চিঠি ফেলা যায়। ও বাড়ির মিঃ ঘোষালকে রিকোয়েস্ট করলে উনি পুলিশকে খবরটা দিয়ে দেবেন! ইন ফ্যাক্ট উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, সেরকম কোনো দরকার আছে কি না!

—না, থাক, এখন দরকার নেই।

—যত দেরি হবে ততই কিন্তু ওরা পেয়ে বসবে।

—শোন, অনুপ, কারখানাটা তো আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে চাই না? আবার চালাতে চাই। চালাতে গেলে ঐ লোকগুলোকে দিয়েই চালাতে হবে। ওদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করে কী আমার লাভ হবে?

—তিক্ততার আর বাকি আছে কী? ঐ যাদবটাই পালের গোদা, ওকে যদি সরানো যেত?

বাইরে হঠাৎ স্লোগান শুরু হয়ে গেল। সবক'টা জানলা বন্ধ রাখলেও সে আওয়াজ শোনা যায়।

রত্নেশ আর অনুপ চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

রত্নেশের কাচ কারখানার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে ছ'মাস আগে থেকে। নানা ধরনের কাচের জিনিস সে রাজ্য সরকারকে সাপ্লাই করে, রাজ্য সরকারের

হাতে এখন টাকা নেই, তাই অর্ডারও কমে গেছে। বাইরের বিল পাওনা আছে অনেকগুলো। রত্নেশের মূলধন বেশি নয়। ব্যাঙ্কের সুদ দিতে দিতে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়।

এই সময়ে আবার শুরু হলো শ্রমিক বিক্ষোভ। ক্যান্টিনে শস্তা খাবারের দাবি। ব্লো-পাইপ সেকশানে কাজ অনেকদিনই বন্ধ, তার ওপর সেখানে একদিন তাড়তুর হতে অনুপ চারজন কর্মীকে সাসপেণ্ড করে। সে কিছু অন্যায় করেনি, কারখানায় অন্তত ডিসিপ্লিন রাখতে হবে তো!

সেই ঘটনা উপলক্ষ্য করে ইউনিয়ন লাগাতার স্ট্রাইক ডাকল। তখন লক-আউট ঘোষণা করা ছাড়া আর উপায় নেই। সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে রত্নেশের কান্না পেয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তো ব্যবসা নয়, কারখানাটা তার নিজের হাতে গড়া, অনেক শ্রম, অনেক স্বপ্ন মিশে আছে। মোট সাতাত্তরজন কর্মীর প্রত্যেককে নাম ধরে চেনেন রত্নেশ, এর আগে কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি। বিধু দাস নামে একজন পুরোনো কর্মী রিটায়ার করার পর তার ছেলে মাধবকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল সেই একই পোস্টে, এই মাধবই ইউনিয়নের নেতা হয়ে বসেছে, বছর খানেক ধরে সে নানান ছুতোয় গোলমাল পাকাচ্ছে!

লক-আউট ঘোষণা আইনসঙ্গতভাবে জারি করার আগেই কী করে যেন খবর টের পেয়ে যায়, ওরা দল বেঁধে আসে মালিকের বাড়ি ঘেরাও করতে। অনুপ ছুটতে ছুটতে এসে রত্নেশকে সে খবর দিয়ে বলেছিল, সেজদা, তুমি পুলিশ প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করো। ডি সি ডি ডি মিঃ হালদার তো তোমার বন্ধু...

রত্নেশ রাজি হননি। পুলিশ এসে যদি লাঠি চালায়, গুলি চালায়? তাঁর নিজের কারখানার শ্রমিক, তাদের তো তিনি শত্রু মনে করেন না। রত্নেশের যে এখন টাকা পয়সার সাঙ্ঘাতিক টানাটানি চলছে, ব্যাংক ওভার-ড্রাফ্‌ট দেবে না বলেছে, তা ওদের বুঝিয়ে বললে কি কিছুদিনের জন্য ওরা মেনে নেবে না?

তাড়াহুড়ো করে কিছু চাল-ডাল, মাছ-মাংস বাজার করে আনা হয়েছে। ওরা দরজা আটকে রাখলেও রত্নেশরা অনাহারে থাকবেন না। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের পর রত্নেশের দু পেগ হুইস্কি খাওয়া অভ্যেস, হুইস্কিরও স্টক আছে, সোডা আনানো যাবে না, এই যা!

মাত্র তিনদিন কেটেছে, এর মধ্যে সেরকম কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু মনের ওপর সাঙ্ঘাতিক একটা চাপ। সব সময় মনে হয় তাঁরা গৃহবন্দী। কেউ হাসে না, কেউ জোরে কথা বলে না, একমাত্র রাজা ছাড়া। সে শিশু, সে এখনো কিছুই বোঝে না, সারা বাড়িময় সে খেলতে খেলতে চ্যাঁচায়। সুমিত্রাই ভেঙে পড়েছেন বেশি, যখন তখন তাঁর চোখে জল আসে।

রত্নেশের তবু এই এক জেদ, কিছুতেই তিনি পুলিশ ডাকবেন না।

এর মধ্যে দু'বার আলোচনার চেষ্টা চালিয়েও ভেস্তে গেছে। আলোচনা চালাতে গিয়েছিল অনুপ, রত্নেশকে সে যেতে দেয়নি ওদের সামনে। রত্নেশ নরম স্বভাবের মানুষ, ওরা সেন্টিমেন্টের ওপর খুব চাপ দিলে উনি হয়তো ফট করে কিছু একটা কমিট করে বসবেন। কিন্তু ব্যাংকের সুদ কোনো সেন্টিমেন্টকে রেয়াৎ করে না।

ওরা পালা করে করে ধর্না দিচ্ছে বাড়ির সামনে। এমনকি রাত্তিরেও থাকে কয়েকজন। মাঝে মাঝে শ্লোগানের ঝড় তোলে, শুরুতাল থেকে অশ্রাব্য গালাগালও শুরু হয়েছে। যে চারজনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, তাদের গলাই বেশি শোনা যায়।

গালিগালাজ শুনলেই অনুপের চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে, সে সেজদার দিকে তাকায়। পুলিশের ওপর মহলে এত চেনা জানা, অথচ এত অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে?

ঝট করে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় চলে এল অনুপ। তার সাহস আছে, বিক্ষোভকারীরা তাকে ইট মারতে পারে, সে ঝুঁকি নিতেও সে ভয় পায় না। ইট ছুঁড়ল না বটে, নিচের লোকেরা তার উদ্দেশ্যে শ্লোগান ও গালাগাল ছুঁড়তে লাগল অজস্র।

অনুপ চেঁচিয়ে বলল, মাধব কোথায়? আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই!

দু'তিনজন একসঙ্গে উত্তর দিল, তোমাকে চাই না, মালিককে পাঠাও!

আড়াল থেকে একজন কেউ বলল, শালা, দালাল!

সুমিত্রা চা নিয়ে এসেছেন, রত্নেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমিই যাব, ওদের সঙ্গে কথা বলব!

সুমিত্রা ত্রস্তভাবে বললেন, না, তুমি যাবে না। ওরা গুণ্ডা এনেছে!

রত্নেশ বললেন, আমাকে মারবে? আমার কারখানার লোক আমাকে মারবে? তা যদি সত্যিই হয়, তা হলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?

পায়ে চটি গলিয়ে রত্নেশ চলে এলেন সিঁড়ির দিকে। ওপর থেকে রাজা বললো, বাবা! বাবা! আমার ইস্কুল আজও ছুটি?

ছেলের সঙ্গে নব্‌কৌতুকে যোগ দিতে পারলেন না রত্নেশ। কোনোক্রমে মাথা নেড়ে নেমে এলেন নিচে।

সদর দরজাটা খুলতেই শ্লোগান থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা ঠেলাঠেলি শুরু হল। ওদের মধ্যে রত্নেশ দেখতে পেলেন জান্নুকে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন। গ্রাম থেকে বাচ্চা বয়সে জান্নুকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন।

বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটত। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। দেশে ওদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ বলে রত্নেশ ওকে কারখানার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ বাড়িতেই থাকে, খায়, কারখানার মাইনে পায়। সেই ভানুও গিয়ে ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ?

ভিড় ঠেলে মাধব সামনে এগিয়ে এসে সকলকে চুপ করতে ইশারা করল, তারপর রত্নেশের চোখে সোজাসুজি চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, মিঃ রায়, কিছু ঠিক করলেন ?

মাধবের বাবা বরাবর রত্নেশকে হুজুর বলে সম্বোধন করেছে। এখন দিন কাল বদলেছে।

রত্নেশ বললেন, আমার বাড়ির সামনে এরকম নাটক করলে কী লাভ হবে ? আমি তো বলেছি, আমাকে তোমরা সময় দাও, একটু সামলে উঠতে দাও, এর আগে আমি তোমাদের....

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মাধব বলল, কতদিন সময় চান ? সাতদিন ? দশ দিন ? আমাদের ম্নিটুন অ্যাশিওরেন্স দিন !

রত্নেশ বললেন, সাত-দশদিনের প্রশ্ন নয়। বাজার মন্দা, নতুন অর্ডার না পেলে প্রোডাকশান হবে কি করে ? আর মাল বিক্রি না করতে পারলে আমি টাকাই বা পাব কোথায় ? আমার বাড়িতে কি টাকার খনি আছে ? তবে আশা করছি, তিন চার মাসের মধ্যে বাজার ফেভারেবল হবে, নেক্সট বাজেটের সময়...

পেছন থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠল, ততদিন কি আমরা না খেয়ে থাকব ? অন্য সবাই গুঞ্জন করে তার সমর্থন জানাল।

মাধব বলল, মিঃ রায়, প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, এটা মানবেন তো ? কারখানার প্রোডাকশান কমে গেলে আপনার পরিবারের খাওয়া পরার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, তাহলে আমাদেরই বা হবে কেন ? আমাদের ছেলেমেয়েরা না খেয়ে থাকবে ?

পেছন থেকে অনুপ বললো, এসব অবান্তর কথা। শস্তা সেন্টিমেন্ট। এইভাবে কথা বললে প্র্যাকটিক্যাল সলিউশনে আসা যায় না !

ওরা সবাই হৈ হৈ করে আবার শ্লোগান দিয়ে উঠল।

রত্নেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন, তোমরা ট্রেড ইউনিয়নের নামে বাঙালির সর্বনাশ করছ। সব ব্যবসা মাড়োয়ারিদের হাতে চলে যাচ্ছে, সেখানে তোমরা কিছু কর না। রক্ত জল করা পরিশ্রমে কারখানাটা গড়ে তুলেছি, সেটার তোমরা সর্বনাশ করতে চাও ! সিক ইণ্ডাস্ট্রি ডিক্লেয়ার করলেও তো সরকার নেবে না।

মাধব চেঁচিয়ে উঠল, চুপ ! চুপ ! সবাই আস্তে, আমাকে কথা বলতে দিন।

তারপর সে রত্নেশের দিকে ফিরে বললেন, শুনুন মিস্টার রায়, কারখানার মালিক ইংরেজ হবে না মাড়োয়ারি হবে না বাঙালি হবে, তা ঠিক করবেন দেশের সরকার। আমরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আমরা চাই আমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক। কারখানাটা বাঙালির হলে কি আমাদের খিদে বাগ মানবে ?

কথার পিঠে কথা চলতেই থাকে। তর্কের উত্তপ্ত ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়ে। অনুপ এগিয়ে এসে কিছু বলতে গেলেই অন্য পক্ষ বাধা দেয়। রত্নেশ ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করেন।

এক সময়ে তিনি বললেন, তোমরা কী চাও, সত্যি করে বলো তো ? আমার কারখানাটা ধ্বংস করতে চাও ? দেশে এত বেকার, কারখানাটা বন্ধ হলে যে আরও বেকারের সংখ্যা বাড়বে, তা তোমরা বোঝো না ?

মাধব পরিষ্কার গলায় বললো, আমরা কারখানাটা খুলতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি যাতে গোপনে গোপনে কারখানাটা বিক্রি করে পালিয়ে যেতে না পারেন, সেইজন্যই তো আপনার বাড়ি আমরা ঘেরাও করে রেখেছি।

—আমি পালিয়ে যাব, এরকম কথা বলতে পারলে ?

—আপনি পালিয়ে যাবেন, সে কথা তো বলিনি। বলেছি, যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন।

পেছনে হাসির ধুম পড়ে গেল। একজন কেউ মন্তব্য করল, রোজ মাংস রান্না হয়, বাইরে থেকে গন্ধ পাই। আমরা শালা বাইরে বসে মুড়ি চিবোচ্ছি....

অনুপ রত্নেশের হাত ধরে টেনে বলল, মেজদা, ভেতরে চলে এসো, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

রত্নেশ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাধবের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, শোনো, আমি শেষ প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একশো টাকা করে ইনটারিম রিলিফ দিতে রাজি আছি, তোমরা ধর্মঘট তুলে নাও, কাল থেকে কারখানা চালু করো !

অবস্থা এমন সংকটজনক যে রত্নেশের পক্ষে এখন হুট করে পাঁচ ছ' হাজার টাকা জোগাড় করাও শক্ত, তবু তিনি বেপরোয়াভাবে প্রত্যেককে একশো টাকা করে রিলিফ দেবার প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন। অনুপের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেননি।

রত্নেশ আশা করেছিলেন, তাঁর এই আকস্মিক উদারতার পরিচয় পেয়ে সকলের মুখে হাসি ফুটবে, তারা জয়ধ্বনি দেবে। প্রতিক্রিয়া হল ঠিক উল্টো।

মাধব ভুরু তুলে বলল, আপনি আমাদের অপমান করছেন ? আমরা কি ভিখিরি ? আপনার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে রোদ্দুর-বৃষ্টি মাথায় করে বসে আছি বলে আপনি একটা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে ?

আমরা চাই সম্মানজনক চুক্তি। আমাদের যে সাতদফা দাবি আছে, তার প্রত্যেকটি ধরে ধরে।

রত্নেশের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল, তিনি আর মেজাজ সামলাতে পারলেন না, তিনি বলে উঠলেন, নিরকহারাম! আম ইয়োর সাতদফা চুক্তি! আমার যা বলার বলেছি, যদি খাটতে না চাও তো আমি কারখানা তুলে দেব!

সঙ্গে সঙ্গে উঠল তুমুল শ্লোগানের ঝড়। ঠেলাঠেলিও শুরু হয়ে গেল, কয়েকজন রত্নেশকে টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করল, মাধব বাধা দিতে লাগল তাদের।

অনুপ কোনোক্রমে রত্নেশকে উদ্ধার করে এনে বন্ধ করে দিল দরজা। দুমদাম করে আওয়াজ হতে লাগল তার ওপর।

ভেতরে এসেও রত্নেশ রাগে চিৎকার করতে লাগলেন, এদেশটা কি সোশ্যালিস্ট হয়ে গেছে? বোঝা গেছে তো সরকারের মুরোদ! তোদের পার্টি মাড়োয়ারিদের পায়ে তেল দেয়, মাড়োয়ারিদের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করে…না খেয়ে থাকতে হয় তাও সই, তবু আমি ঐ কারখানা আর খুলব না।

রত্নেশের উঁচু ব্লাডপ্রেশার আছে, এরকম রাগারাগি করলে হঠাৎ খারাপ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে, তাই সুমিত্রা তাঁর মাথাটা বুকে চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, চুপ করো, প্লীজ, শান্ত হও, প্লীজ।

এক সময় রত্নেশ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

অনুপ বলল, মেজদা, তা হলে পুলিশে।

সেই অবস্থাতেও মাথা তুলে রত্নেশ বললেন, না—।

কিন্তু পরবর্তী দু'দিনে অবস্থা অনেক ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে ইট পড়তে লাগল জানলায়, সন্ধেবেলা কাছাকাছি দুটি বোমা ফাটল। মাধব মাইকে ঘোষণা করল, বন্ধুগণ, আপনারা সংযত ভাবে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলুন। প্রতিক্রিয়াশীলরা সমাজবিরোধীরা এই সুযোগ নিয়ে গোলমাল পাকাতে চাইবে। মালিকপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে একটি ইটও আমরা ছুঁড়িনি, আমরা বোমা ফাটাইনি, তবে আমাদের ওপর যদি আক্রমণ করা হয়, আমরা প্রতিরোধ করব।…

পুলিশ নিজে থেকেই এল, দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

অনুপ আর সুমিত্রা রত্নেশকে অনবরত বোঝাচ্ছে যে এইভাবে দিনের পর দিন বাড়িতে বন্দী থেকে লাভ কী হবে? তাতে কী সমস্যার সুরাহা হবে? একটা কিছু তো করা দরকার। পুলিশের সাহায্য না নিলে।…

রত্নেশ দু'দিকে মাথা নাড়েন। ওরা বেপরোয়া হয়ে আছে, যদি রক্তপাত হয়? না, না, না, সে দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না।

পরদিন সকালে অনুপ নিজেই একটা ঝুঁকি নিল। সে জোর করে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরে চড়চাপড় শুরু করতে না করতেই হস্তক্ষেপ করল পুলিশ। পাশের বাড়ির সাহায্য নিয়ে সে পুলিশকে আগে থেকেই খবর দিয়ে রেখেছিল নিশ্চয়ই।

পুলিশ অনুপকে উদ্ধার করে তুলে নিয়ে গেল গাড়িতে। অনুপ হাইকোর্টে গিয়ে ইনজাংশন এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করাল। রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করল। সরকার পক্ষ এখন বন্ধ কারখানাগুলো খুলতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, নতুন করে কোনো কারখানা বন্ধ করতে আর উৎসাহী নন, মালিকদের সঙ্গে আপোষের নীতি নিয়েছেন। শ্রমিক বিক্ষোভ সম্পর্কে তাঁরা ক্ষুব্ধ মনোভাব দেখালেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিকেলের মধ্যেই পুলিশ এসে অবস্থানকারীদের সরিয়ে দিয়ে গেল, তারা আর ফিরে এল না। লেবার কমিশনার আগামী সপ্তাহে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দিয়েছেন।

সন্ধেবেলা এ বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার, সব কিছু আবার স্বাভাবিক। তবু রত্নেশের মেজাজ ভালো নেই, তিনি গুম হয়ে আছেন, কোনো কথা বলছেন না। সুমিত্রা কিছু বলতে এলেও তিনি উত্তর দিচ্ছেন না। অনুপ ইশারায় সুমিত্রাকে জানাল, আজকের দিনটা থাক, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

সারা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, হঠাৎ এক সময় একটা সুরেলা রিনরিনে কণ্ঠ শোনা গেল, মালিকের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও! শ্রমিকের মুখের অন্ন কাড়তে চাও, রত্নেশ রায় জবাব দাও, জবাব দাও!

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে আসছে রাজা।

কোথা থেকে সে এক টুকরো লাল কাপড় জোগাড় করেছে, সেটা বেঁধেছে একটা লাঠির মাথায়। এই ক'দিন অনেক শ্লোগান শুনে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজকে এইটাই তার নতুন খেলা।

ঝাণ্ডা বাঁধা লাঠিটা দোলাতে দোলাতে বাবার সামনে এসে সে বলতে লাগল, মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও! রত্নেশ রায় জবাব দাও, জবাব দাও! মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই!

সুমিত্রা আঁতকে উঠে ছেলের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন, রাজা! চুপ, চুপ! কী বলছিস তুই!!

রাজা দৌড়ে দৌড়ে ঘুরতে লাগল, ঘরের চারদিকে। মুখে সেই এক কথা।

রত্নেশ রায় মুখ তুলে কাতর ভাবে হাসলেন। তারপর সুমিত্রাকে বললেন, থাক, ওকে ধরো না! বলুক!

ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

তৃষ্ণার্ত রাজা এসে থামলেন এক স্বচ্ছ সরোবরের সামনে।

নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কী যেন মোহ ভর করেছিল তাঁর ওপর, তিনি মানুষের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ একাকী চলে এসেছেন গভীর থেকে গহনে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেই জলাশয়ের ধারে বসে আঁজলা ভরে পান করতে যাবেন, এমন সময় কয়েকটি নারী কণ্ঠ এক সঙ্গে বলে উঠল, হে রাজন! এই জল ছুঁয়ো না। এই জল পান করো না। তুমি অন্য সরোবরে যাও!

রাজা মুখ তুলে দেখছিলেন তিনটি যুবতী সেই সরোবরে হংসের মতো ভাসছে। হলুদ রেশমের মতো তাদের মুখ, পদ্ম পলাশ চক্ষু, উড়ন্ত পাখির মতো ওষ্ঠাধর।

রাজা কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন।

রমনী বিলাসে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর, দেশ-বিদেশের বহু নারী তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হলো এই যুবতীত্রয়ী প্রত্যেকেই যেন তিলোত্তমা।

একটি মেয়ে একটু এগিয়ে এসে মধুর হেসে বলল, রাজা, আমরা নিরালায় এখানে কেলি করছি, এখানে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। এই জল তোমার পেয় নয়, তুমি শীঘ্র অন্যত্র যাও!

রাজা বললেন। অয়ি, বরবর্ণিনী, তোমাদের দেখে আমার তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে স্বাদু পানীয় দেখলে কি কোনো তৃষ্ণার্ত দূরে চলে যেতে পারে? কেন আমাকে নিবারণ করছ? কেন আমাকে চলে যেতে বলছ?

সেই মেয়েটি বলল, রাজা, সব ফুলের ঘ্রাণ নিতে নেই, সব পানীয় পান করা

যায় না, সব ফল ভক্ষণ করা ঠিক নয়। এই সরোবর তোমার জন্য নয়, তুমি অন্য কোথাও যাও!

রাজা এবারে হেসে বললেন, তোমরা আমার পরিচয় জানো না। আমি রাজা কোনো প্রকার নিষেধ শুনলেই আমাদের বাসনা বেশি বলবান হয়। যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুই আমরা জয় সাধ্য মনে করি। আমি অচিরেই তৃষ্ণা মেটাব এবং তৃষ্ণা মেটাব।

তিন নারী আবার একত্রে কলকণ্ঠে বলে উঠল, রাজা অমত করো না, এমন করো না! নিবৃত্ত হও!

রাজা শুনলেন না। তিনি গণ্ডূষ জল পান করলেন। তারপর তাঁর বস্ত্র খুলে রেখে নেমে পড়লেন সরোবরে।

রাজা সন্তরণ-পটু। জলাশয়টিও তেমন বড় নয়। রাজা ভাবলেন, মেয়ে তিনটি পালাবার চেষ্টা করলেও তিনি অন্তত একজনকে বাহুবন্ধনে আনতে পারবেন ঠিকই। ওরা অপ্সরা হলেও নিষ্কৃতি নেই।

যুবতী তিনটি কিন্তু দূরে সরে গেল না বক্ষ জলে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

রাজা কাছে আসতেই তারা বলে উঠল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা একের মুগপাকীটির হাত ধরলেন। তারপর বললেন, কবিতা এবং বনিতা স্বয়ংগতা হলেও সুখদা নয়। হে সুন্দরী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি তোমার রূপ প্রার্থনা করি, তুমি আমার হও।

মেয়েটি তবু হাসতে লাগল।

রাজা মেয়েটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিচিত্র এক অনুভূতি হলো। তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ নেই, শিহরণ নেই। এমন যে দুর্লভ রূপসীকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তবু তাঁর কামনা যথোচিত জাগ্রত হচ্ছে না কেন?

মেয়েটি বলল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছ, তুমি? কার নিয়তি?

মেয়েটি বলল, তোমার! হায় ভূতপূর্ব রাজা তুমি আর ইহজীবনে কোনো রমণী-রমন সুখ পাবে না।

—কেন?

—নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ!

রাজা আপন শরীরের দিকে তাকিয়ে আমূল চমকে উঠলেন।

তিনি আর রাজা নেই। তিনি এক নারীতে পরিণত হয়েছেন। অন্য তিনটি নারীরই মতো।

সেই তিন রমণীর মধ্যে একজন বলল, তোমাকে এখন কী বলব, রাজা না রানী। শুধু রমণীই বলি। শুহে রমণী, আমরা দিব্যাঙ্গনা। পৃথিবীর কোনো পুরুষ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। এটা একটা মায়াসরোবর। সাধারণ মানুষ এটা দেখতেও পায় না। তোমার নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

পর মুহূর্তেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল সেই মায়াসরসী। সবটাই যেন স্বপ্ন।

কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার শরীরটা স্বপ্ন নয়। তিনি রমণী হয়েই রইলেন। বিবস্ত্র বলে তাঁর ব্রীড়া এল। তিনি প্রথমে স্তনদ্বয় ঢাকলেন দু হাত দিয়ে। তারপর এক হাত বুকে রেখে, অন্য হাতে চাপা দিলেন নিম্ননাভি, তাঁর ভঙ্গিটি হলো চিরকালীন প্রথাসিদ্ধ নিরাবরণ নারীর মতোই।

রাজার অশ্ব আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা আস্তে আস্তে তাঁর রাজ্য, তাঁর মহিষীবৃন্দ, তাঁর সন্তানাদির কথা ভুলতে লাগলেন। অরণ্যের মধ্যে একাকিনী অবস্থায় তাঁর ভয় করতে লাগল।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পরে তিনি এক নবীন যুবার সাক্ষাৎ পেলেন।

যুবকটি ঋষি-কুমার, অঙ্গে গেরুয়া, মাথায় জট-বাঁধা চুল।

যুবকটি এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, হে অচেনা, তুমি কে?

রাজার তখনও স্মরণে আছে যে তিনি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটি নারীর। তিনি বললেন, আমি কেউ না!

যুবকটি বলল, তোমাকে দেখে আমার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ এক অনুভূতি জাগছে। তুমি কি স্বপ্ন না মায়া? মতিভ্রম না তাবৎ জীবনের গুঞ্জন?

নারীরূপিনী রাজা আবার বললেন, আমি কেউ না!

তখন সেই মুনিকুমার এগিয়ে এসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার জীবনে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার হলো। জীবনে তিনি বহু নারীকে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু আজ তাঁর শরীরে এই পুরুষের স্পর্শে যে তরঙ্গ খেলে গেল, তেমনটি তো আগে কখনো হয় নি। তাঁর তীব্র ইচ্ছা হলো এই যুবা তাকে বক্ষে টেনে নিক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে একটু দূরে সরে গেলেন।

তরুণ ঋষি আবার কাছে এসে তাঁর বক্ষে হাত রাখতে যেতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, না!

তখন সেই কামার্ত যুবা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, হে রূপসী-শ্রেষ্ঠা, তোমার নয়ন কাছে আহত। তোমার অধর সুধায় আমায় সঞ্জীবিত করো। আমার যাগ-যজ্ঞ সব জলাঞ্জলি যাক। আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হতে চাই।

আরও কিছুক্ষণ স্তব স্তুতি শোনার পর নারী-রাজা সম্মত হলেন।

তারপর তিনি পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। রমণে এত সুখ তা তিনি জানতেন না। আগে মনে করতেন রতি সুখ মানে অন্যের আনন্দ। এতকাল তিনি ওপরে থাকতেন, আজ নীচে। পিঠের তলায় যে মাটি কাঁপে, ওপরে আকাশও যে কাঁপে তা বোধহয় কোনো পুরুষই জানে না।

চরম উল্লাসে তিনি আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন।

মুনি-কুমার তাঁর ক্রীড়া শেষ করা মাত্রই রমণী-রাজার ইচ্ছে হলো, আবার হোক, আবার হোক। এই যুবা তাকে পীড়ন করুক, দংশন করুক, তাকে স্বর্গ সুখ দিক।

সেই যুবা ঋষিকেই বিয়ে করে রমণী-রাজা বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে ঘর-সংসার করতে লাগলেন।

বেশ কয়েক বছর পর সেই রাজার প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ঋষিপত্নীর সামনে সসম্মানে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী বললেন, হে আত্মবিস্মৃত রাজা ভঙ্গস্বন, আমরা অতিকষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনি একবার কলহ করেছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার মনে মোহ এনে দিয়ে আপনাকে নারীতে পরিণত করেছেন। আমরা যাগ যজ্ঞে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছি। ইন্দ্র আবার আপনাকে পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

ঋষিপত্নীর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ফিক করে হাসলেন।

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, রথ প্রস্তুত, আপনি চলুন!

ঋষিপত্নী বললেন, পাগল নাকি! কোনো রমণী কখনো পুরুষ হতে চায়? হে মন্ত্রী, পৃথিবীর কোনো পুরুষ এতকাল ধরে যে গুপ্ত কথা জানতে পারে নি, আমি তা জেনেছি। পুরুষরা তো চতুর্দিক দাপিয়ে বেড়ায় কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নারীদের কাছে এসে পরাভূত হয়। শরীরের যে কী আনন্দ তা পুরুষরা সঠিক-ভাবে কোনদিন টেরই পেল না! আমি যেমন আছি, চমৎকার আছি। এই আনন্দের তুলনায় রাজপদ অতি তুচ্ছ। আপনারা ফিরে যান। আমার আগের ছেলেদের সিংহাসন দিন। আমার এই পক্ষের সন্তানদের প্রতি স্নেহ বেশি। তাদের ছেড়েও কোথাও যেতে পারব না!

বহুকাল পর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে, ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে দক্ষিণায়নের

প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা জেনে নিতে নিতে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, পিতামহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনসুখ কে বেশি পায় ?

ভীষ্ম বললেন, তোমাকে আমি ভঙ্গস্বন রাজার উপাখ্যান শোনাচ্ছি !

কাহিনীটি শুরু করার আগে ভীষ্ম প্রথমে মৃদু হাস্য করলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাঁর এই ধার্মিক নাতিটি সত্যিই বড় গোবেচারা। কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এই প্রশ্ন কি কেউ কোনো মৃত্যুপথযাত্রী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে করে ?

তারপরই ভীষ্মের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যেন এক বায়ুময় হাহাকার ! জিতেন্দ্রিয় ? সাধারণ মানুষের চারগুণ লম্বা একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন, শুধু নারীর রহস্য কিছুই জানলেন না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ !

অশোক উপাখ্যান
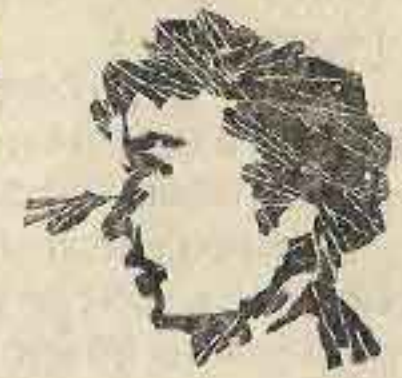
যতদূর মনে পড়ে, ছেলেবেলায় একবারই মাত্র বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল অশোক। তখন তার বয়েস মাত্র সাত বছর। সাত বছরই তো, তখন সে ক্লাস টু-তে পড়ে। তখনও আলিপুর পার্ক রোডের বাড়িটা তৈরি হয়নি, এরা থাকত চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটায়, সে বাড়ির সামনে কোন বাগান ছিল না, খেলবার কোন জায়গাই ছিল না।

সেই দিনটা নিশ্চয়ই ছিল রবিবার কিংবা কোন ছুটির দিন। কারণ, ঘটনাটা ঘটেছিল বেলা একটা বা দেড়টার সময়, ছাদে খুব গনগনে রোদ ছিল অশোকের স্পষ্ট মনে আছে। ছুটির দিন না হলে ঐ রকম সময়ে তো বাবা বাড়িতে থাকতেন না, অশোকেরও স্কুলে থাকার কথা। অবশ্য অনেক ছুটির দিনেও বাবাকে দেখতে পেত না অশোক। বাবা খুবই ব্যস্ত মানুষ, প্রায়ই তাঁকে কাজের জন্য যেতে হত দিল্লি, বোম্বাই, আমেদাবাদ। মাসে অন্তত দু'বার যেতেন ব্যাঙ্গালোরে, সেখানে বাবার আর একটা অফিস ছিল।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সেই বাড়িটার অনেক ঘর ছিল, তার মধ্যে তিনতলার দুটো ঘর ভর্তি বোঝাই ছিল বাবার অফিসের খাতাপত্র। সেই ঘরে ছোটদের ঢোকা নিষেধ। বাবা কলকাতার বাইরে থাকলে ঝি-চাকররাও সেই দুটো ঘরে ঝাড়-পোঁছ করতে ঢুকত না।

তবু সেই সাত বছর বয়েসে, দুপুরবেলা অশোক চুপি চুপি ঢুকেছিল বাবার একটা অফিস ঘরে। বাবা তখন পাশের ঘরেই কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সেই অফিস ঘরটায় ছিল দুটো টিনের আলমারি আর একটা চেয়ার ও একটা

টেবিল। অশোকের স্পষ্ট মনে আছে, সে ঘরে একটার বেশি চেয়ার ছিল না। বাবার যে দু'তিনজন কর্মচারি ঐ ঘরে দেখা করতে আসত তারা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলত। দরজার বাইরে জুতো খুলে ঢুকত তারা। অবশ্য একতলায় তাদের মস্তবড় একটা বসবার ঘর ছিল, তার একদিকে সোফা সেট, আর একদিকে চৌকির ওপর ফরাস পাতা।

অশোক সেই ঘরে ঢুকে টেবিলের ডানদিকের দেরাজ খুলে ফেলেছিল আস্তে আস্তে। সেটা চাবি দেওয়া ছিল না। তার মধ্যে হাত ঢোকাতেই অশোক পেয়ে গিয়েছিল জিনিসটা। একটা রিভলভার।

অশোকের নিজের খেলনা বন্দুক-পিস্তল ছিল। এই জিনিসটা প্রায় সেই রকমই দেখতে। অশোকের খেলনা বন্দুক পিস্তল দেখলে কেউ ভয় পায় না, বরং হাসে। চন্দ্রনাথ কিংবা তুলসী ভাইয়া কিংবা লছমীকে যখন অশোক তার খেলনা পিস্তল দিয়ে গুলি করে, তখন তারা দু'হাতে বুক চেপে ধরে 'আ মর গয়া' বলে হাসতে থাকে। কিন্তু বাবার হাতে এই পিস্তলটা দেখে সরকারজী ভয়ে কাঁপছিল কেন?

দৃশ্যটা অশোক দেখে ফেলেছিল আড়াল থেকে। ছাদের পেছন দিকের কার্নিশ দিয়ে উঁকি মারলে এই ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। লছমী দুধ খাওয়াতে এলেই অশোক ছাদের চতুর্দিকে দৌড়ে দৌড়ে পালাত। আগের দিন সকালে সেই রকম ভাবে দৌড়তে দৌড়তেই অশোক একবার একেবারে এক কোণে এসে পড়ে কার্নিশ ধরে ওঠবার চেষ্টা করছিল, তখনই সে দেখতে পেল যে বাবা এই পিস্তলটা উঁচিয়ে কড়া গলায় সরকারজীকে বলছেন, হাঁ, আমি বাংগালী লোকদের বেশি কেয়ার করি, বেছে বেছে তাদের নোকরি দিই, তাই বলে তোমরা আমার শির পর চড়ে বসবে? তুজকো আওলাদ, তোর ছাতি আমি ফুঁড়ে দেব! বেইমান কাঁহিকা...

সরকারজী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল, ঝুপ করে নীচু হয়ে বাবার পা ধরে কাঁদতে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে বেশ মজা লেগেছিল অশোকের। সাত বছর বয়েসে এ ঘটনার মর্ম বোঝা যায় না। একজন কেউ ভয় দেখাচ্ছে, আর একজন ভয় পাচ্ছে, শিশুর মনোজগতে এই তো মানব সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য। জন্ম থেকে এই রকমই তো তারা দেখে। এর মধ্যে যে ভয় দেখায়, যে কোন শিশু তাকেই পছন্দ করে, সেও ঐ রকমই একজন হতে চায়।

অশোকের চোখে বাবা একজন বীরপুরুষ। সেই জন্য সে বাবার খেলনাটা

নিতে গেয়েছিল।

রিভলভারটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সে জানে, তার হাতে এটা দেখলে লছমী বা তুলসী ভাইয়ারা ভয় পাবে না, খেলনা পিস্তলই ভাববে। তাকে এখন সরকারজীর মতন কারুনিব একেকটি প্রতিপক্ষ তৈরি করে নিতে হবে, সেই জন্য ছাদে যাওয়া দরকার।

কিন্তু লছমীই আগে তাকে দেখতে পেল। অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, আরে, ছোটবাবু তুম পিতাজীর ঘরে ঘুসেছিল? ওটা কী নিয়েছ? আরে বাপ রে বাপ!

অশোকের বাবার ঘুম খুব পাতলা। তিনি লছমীর চিৎকার শুনেই বাইরে ছুটে এসেছিলেন। কনিষ্ঠ সন্তানের হাতে রিভলভারটি দেখা মাত্র তিনি চিনে ফেললেন, দারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ে গেল, রিভলভারটি লোড করা এবং খুব সম্ভবত সেফ্‌টি ক্যাচ আটকানো নেই।

তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, অশোক বেটা, কেন আমার জিনিস নিয়েছ? তুমার কত্তো টয় আছে, রাখ দো, জমিন পর রাখ দো, ধীরে ধীরে।

অশোক রিভলভারটি উঁচিয়ে, খলখল করে হেসে বলেছিল, পিতাজী, ডিসুম! ডিসুম।

তৎক্ষণাৎ রঘুবীরপ্রসাদ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, এলোমেলো গুলি ছিটকে আসবে। ছেলেটা নিজেই মারা পড়তে পারে—

বাবাও সরকারজীর মতন ভয় পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন দেখে আরও মজা পেয়েছিল অশোক। তাহলে বাবার চেয়েও সে বড় বীরপুরুষ! এই খেলাটা তো চমৎকার!

সে রিভলভারটার মুখ ঘোরালো বাবার দিকে।

মাটি থেকে মুখ না তুলে রঘুবীরপ্রসাদ বলে যাচ্ছিলেন, লছমী, উসকো পাকড়ো...অশোকবেটা, উয়ো টয় রাখ দো, অনেক ভাল ভাল টয় দিব, চকোলেট, পেস্ট্রি, যো তুমি মাঙবে.. লছমী, মাইজীকো তুরন্ত বোলাও, অশোক বেটা, এইসা মাৎ কর না, তুমার পিতাজী মরে যাবে—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি। অশোকের মা এসে পড়েছিলেন। মা একটুও ভয় পাননি। মা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, দে, ওটা আমায় দে। অশোক, দুষ্টুমি করিসনি, দে বলছি!

অশোক তবু দিতে চায়নি, মা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন রিভলভারটা।

তখন দেখা গেল বাবার রাগ। এর আগে তিনি অশোককে কোনদিন কড়া কথা বলেননি পর্যন্ত। সেদিন খাট থেকে উঠে এসে তিনি অশোকের সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগলেন। অশোকের হাতে তখন আর অস্ত্র নেই, বাবার শারীরিক শক্তি বেশি, সেইজন্য তিনি ভয় দেখাতে পারেন ছেলেকে। শুধু ভয় দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, শেষ পর্যন্ত রাগ সামলাতে না পেরে ছুটো চড় কষিয়ে দিলেন।

সেই ঘটনা অশোক কোনদিন ভুলতে পারেনি। এর কয়েকমাস পরেই অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দার্জিলিংয়ের কনভেন্ট স্কুলে। ছুটিতে বাড়ি এলে বাবা খুব ভাল ব্যবহার করতেন। অশোকের কোন শখ মেটাতে বাবা কখনো কার্পণ্য করেননি।

অশোকের যখন সতেরো বছর বয়েস, তখনই বাবা তাকে একটি ফিয়াট গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। অশোকের নিজস্ব গাড়ি। এক বছর বয়েস বাড়িয়ে অশোক সেই সময়েই ড্রাইভিং লাইসেন্স করে নিয়েছিল।

কৈশোর পার হবার পর অশোক বাবার একটা অন্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। বাবা আগে প্রায়ই বাংলা বলতেন, বাংলা অনেকটা ভালই শিখেছিলেন। কিন্তু আজকাল আর বাংলা বলতেই চান না। বাড়িতে কেউ বাংলায় কথা বললে তিনি স্পষ্ট বিরক্ত হন।

অশোকের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু সে বাঙালী নয়।

রঘুবীরপ্রসাদ ছাত্র বয়েসে একবার শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন। সেই উৎসব দেখে তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবেন। সেই ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করা খুব সহজ ছিল না। তিনপুরুষ ধরে তাঁদের পরিবার কলকাতাবাসী হলেও বিয়ে-শাদী হয় রাজস্থানে। রঘুবীরপ্রসাদের বাবা অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন, তাঁর অমতে যাওয়ার সাধ্য রঘুবীরপ্রসাদের ছিল না। স্বজাতির মধ্যেই বাবার মনোনীতা পাত্রীকে বিয়ে করতে হল। কিন্তু সেই স্ত্রীর মৃত্যু হল এক বছরের মধ্যেই।

তার তিন বছর পর, রঘুবীরপ্রসাদ তাঁর বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর তাঁর সাধ পূর্ণ করেছিলেন। পুণ্যশীলা রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় রেবাছুনে। রঘুবীরপ্রসাদের কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাব রায়চৌধুরী পরিবার প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি।

বিয়ের পর কিছুদিন রঘুবীরপ্রসাদ বাংলা সংস্কৃতির প্রতি অনেকখানি আকৃষ্ট

হয়েছিলেন। ঘন ঘন বাংলা সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়া, বাড়িতে বাংলা গানের রেকর্ড। কিছু কিছু বাঙালী রান্না। বংশগত ভাবে নিরামিষাশী হলেও একদিন তিনি চিংড়ি মাছ চেখে দেখলেন এবং পছন্দও করলেন।

কিন্তু এই প্রীতি বেশিদিন টেকেনি। ব্যবসা জগতে তিনি বাঙালী কর্মচারীদের কাছ থেকে বারবার আঘাত পেয়েছেন। তাদের তিনি বেশি বেশি সুযোগ দিলেও তারা বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারেনি। তাছাড়া, এদের অনেকের মুখেই একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি লেগে থাকে, এটাই তার অসহ্য মনে হয়। ও' পয়সার মুরোদ নেই, তবু একটা গবজান্তা ভাব। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন যে বাঙালী জাতটা নিমকহারাম। যতই এদের দাও, একটু পেছন ফিরলেই নিন্দে শুরু করবে। বাঙালীরা নিজেরা যা পারে না, অন্য কেউ তা পারলেও এরা তা মেনে নিতে শেখেনি।

পুণ্যশীলার একটা বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি পরপর পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, প্রত্যেকটিই ছেলে। এইসব পরিবারে পুত্রসন্তানের বড় কদর। অবশ্য সব ভারতীয় পরিবারেই তাই, তবে ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়েরা শুধু যে সম্পত্তির একটা বড় অংশ নিয়ে চলে যায় তাই-ই নয়, ব্যবসায়েও ভাগ বসাতে চায়।

অশোকের ওপরের চারটি ভাই-ই বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। প্রত্যেকেই মাঝারি ধরনের লেখাপড়া শিখে ব্যবসাতে মন দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা প্রান্তে।

অশোক একেবারে ছোট ছেলে বলেই হয়তো বেশি বেশি মা ঘেঁষা। বড় হয়ে অশোক জানতে পারে যে বাঙ্গালোরে তার বাবার একটি রক্ষিতা আছে। তার দাদারাও এ ব্যাপারটা জানে, কিন্তু তারা কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। রঘুবীরপ্রসাদকে প্রায়ই বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকতে হয়, তাঁর সেবা যত্নের জন্য সেখানে একজন মেয়েমানুষ রেখে দিলে দোষের কী আছে? কিন্তু এই ব্যাপারটা জানতে পেরে অশোক যেন আরও বেশি তার মাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। মাও কি জানে? অশোক মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। মা যেন বড় বেশি চাপা। মা সকলের সেবা যত্ন করেন, হাসেন, বই পড়েন, কিন্তু মনে মনে তার সম্পর্কে যে কী ভাবেন তা বোঝা যায় না।

অশোক সাবালক হয়ে ওঠার পর তাকেও মায়ের আঁচল ছাড়া করে ব্যবসায় লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রঘুবীরপ্রসাদ। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

সতেরো বছর বয়েসে একটা নিজস্ব ফিয়াট গাড়ি পেয়ে অশোক যেখানে সেখানে চষে বেড়াত। ততদিনে রঘুবীরপ্রসাদ পশ্চিমবাংলায় এগারোখানা পেট্রল

পাম্পের মালিক, সুতরাং অশোকের পেট্রলের কোন চিন্তা নেই।

এক টিপিটিপি বৃষ্টিপড়া সন্ধেবেলা অশোক মোমিনপুরের মোড়ের কাছে উল্টো-দিক থেকে আসা একটা বাসকে কাটাতে গিয়ে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর সঙ্গের একটি সাত-আট বছরের মেয়েকে চাপা দিল। গাড়ির ধাক্কায় দুটো শরীরই ছিটকে পড়ল মাটিতে, গাড়ির চারটে চাকা চলে গেল তার ওপর দিয়ে, মড়মড় করে শব্দ হল। পুরো ব্রেক কষার পরও গাড়িটা বিকট শব্দ করে থামল একটু দূরে। অশোক পেছন ফিরে তাকাল।

গাড়িতে অশোকের এক বন্ধু ছিল। সে কোন কথা না বলে দরজা খুলে নেমেই এক দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অশোক আর কিছু ভাববার সময় পেল না, সেও গাড়ি থেকে নেমে দৌড় মারল।

বৃষ্টির জন্য রাস্তায় বেশি লোক ছিল না। কেউ তাকে তাড়া করে আসেনি। অশোক অন্ধের মতন ছুটতে ছুটতে কোথায় যে গিয়ে পড়ল তা সে জানে না। এই শহরে সে এতদিন আছে কিন্তু কোনদিন পায়ে হেঁটে ঘোরার অভ্যাস নেই। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারত। কিন্তু তার মাথার মধ্যে কোন যুক্তি কাজ করছিল না। মাথাটা যেন ফাঁকা। তার কী নাম, কোথায় বাড়ি এসব কিছুই যেন মনে নেই।

অনেক রাতে জল কাদা মেখে, খালি পায়ে অশোক ফিরে এল বাড়িতে। ততক্ষণে তার বোধ ফিরে এসেছে। বাড়ির বাইরে কোথাও রাত কাটাবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না। তাছাড়া তার কাছে টাকা কড়িও বিশেষ নেই। কোথায় আর যাবে, বাড়িতেই তো ফিরতে হবে। কিন্তু বাবা কী বলবেন, সেই ভয়েই সে কাঁপছিল থরথর করে।

বাড়ি ফিরে সে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল পাগলের মতন। সে কান্না আর থামেই না। দুঃখ বা ভয়ের কান্না নয়, তার মধ্যে সত্যিই যেন মিশে ছিল খানিকটা পাগলামি। মা অনেক প্রশ্ন করে করে ঘটনাটা জেনে নিলেন। রঘুবীরপ্রসাদ সেদিন কলকাতাতেই ছিলেন, তিনি সব শুনে বললেন, বেওকুফ, গাড়ি কাহে ছোড়কে আয়া?

কলকাতা শহরে কোন গাড়ি মানুষ চাপা দিলে সে গাড়ি আর থামে না। থামলেই জনতা এসে আক্রমণ করবে। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ যখন ছিল, তখন অশোক কেন গাড়িটা অকুস্থলে ফেলে এল? রঘুবীরপ্রসাদের ছেলে এত দুর্বল কেন হবে?

পরদিন ভোরেই অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হল দিল্লিতে।

এই ঘটনার ফলে কয়েকটি অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দুর্ঘটনাস্থলেই বাচ্চা মেয়েটি মারা যায়, তার মা দুদিন হাসপাতালে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তবু অশোকের নামে কোন মামলা-মোকদ্দমা হয়নি, রঘুবীরপ্রসাদের ব্যবস্থাপনা এমনই নিখুঁত। এমনকি কয়েকদিন বাদে খানিকটা কাচ-টাচ ভাঙাচোরা অবস্থায় গাড়িটাও ফেরত এনেছিলেন। খবরের কাগজে এই দুর্ঘটনার দায় দিয়ে তাঁদের পরিবারের কোন উল্লেখও ছিল না।

কিন্তু এই উপলক্ষে পুণ্যশীলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর একটা গুরুতর মনোমালিন্য হয়। ব্যবসার ব্যাপারে তার স্বামী কোথায় কত নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছেন তার সব খবর তিনি রাখতেন না। কিন্তু এত বড় একটা মর্মান্তিক ব্যাপারের পরও রঘুবীর-প্রসাদের হৃদয়হীনতা তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেন নি। মামলা-মোকদ্দমা চাপা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক আছে, যে-দুটি প্রাণ গেছে অন্য একজনকে শাস্তি দিলে তো তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে পরিবারটির ওপর এত বড় বিপদ নেমে এলো তাদের তো সাহায্য করা যায়। রঘুবীরপ্রসাদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই।

রঘুবীরপ্রসাদের বক্তব্য হল, টাকা পয়সার প্রশ্ন নয়, এই রকম ঘটনার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের নাম জড়ানোটাই মূর্খতা। টাকা পয়সা তিনি গ্রাহ্য করেন না, পুরো ঘটনাটি ধামা চাপা দেবার জন্য তাঁকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।

তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, অত বেশি বাঙালী বাঙালী করো না। যে-সব পুলিশ তাঁর কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে, লেবার কোর্টে যে হাকিম মামলা ডিসমিস করে দিয়েছে, তারা বাঙালী নয়?

অনেককাল পরে পুণ্যশীলা রাগ করে তিনমাসের জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে রইলেন। আর ওদিকে দিল্লীতে অশোকের মাথার গোলমালের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল। প্রায়ই তার মনে হয়, কয়েকটা ধারালো নখযুক্ত আঙুল তার মাথার ভেতরটা চিরে দিচ্ছে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে, তারপর হাউ হাউ করে কাঁদে।

এদেশে কিছুদিন চিকিৎসার পর অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হল আমেরিকায় তার এক পিসতুতো দাদার কাছে। সেখান থেকে দুবছর বাদে সে ফিরে এলো নতুন মানুষ হয়ে। চেহারা তো ভালো হয়েছেই, ব্যবহারও অনাড়ষ্ট, কথাবার্তা ঝকঝকে।

ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুবীরপ্রসাদ অশোককে জড়িয়ে ফেললেন ব্যবসার কাজে। মায়ের সংস্পর্শে থেকে সে যাতে আবার দুর্বল না হয়ে পড়ে সেইজন্য তাকে

দেওয়া হল রাঁচী অফিসের ভার।

বিদেশ থেকে অশোক এই তত্ত্বটি আরও ভালো করে শিখে এসেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নাও, প্রতিযোগীদের ধ্বংস করো! অস্ত্র মানে আর বন্দুক-পিস্তল নয়, অস্ত্র হল টাকা। তুমি টাকা বাড়িয়ে যাও, অন্য সবাই এসে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে।

অশোক টাকা বাড়ানোর নেশায় মেতে উঠলো। সে এখন সম্পূর্ণ নির্দয়। কোনো কর্মচারী তার নির্দেশ মানতে সামান্য গাফিলতি করলেই অশোক তাকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেয়। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলে অশোক তাকে ধনে-প্রাণে মারে। পেট্রোলে কেরোসিন মেশাও, সিমেন্টে গেঁড়িমাটি মেশাও, তাতে টাকা বাড়বে। সরকারের কনট্রাক্ট নেবার পর মাল সাপ্লাই না দিয়ে বিল সাবমিট কর, কয়েক পারসেন্ট এদিক ওদিক ছড়িয়ে দাও, তোমার টাকা বাড়বে। নতুন কারখানা খোলা হবে বলে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করো, ঠিকেদারদের হাত করে ওদের ঝুপড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও! এম-এল-এ আর মন্ত্রীদের মাঝে মাঝে বি এন আর হোটেলে ডেকে এনে খাওয়াও-দাওয়াও আর হাতে একটি করে খাম ধরিয়ে দাও তারপর দেখো কেমন করে ওরা তোমার পা চাটে!

কয়েক বছরের মধ্যে রঘুবীরপ্রসাদকেও স্বীকার করতে হলো যে এ ছেলে তার বাবাদেরও ছাড়িয়ে যাবে। তার উন্নতি প্রায় সরল রেখায় চলেছে, একটুও বাঁক নেই। নতুন নতুন ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে সে। এখন অশোক যা ছুঁচ্ছে তাই-ই সোনা হয়ে যাচ্ছে। একজন সরকারি অডিটারকে অশোক এমন নিখুঁত কায়দায় খুন করালো যে সে ব্যাপারে কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না। রঘুবীর-প্রসাদ একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এই ছেলের বিয়ে দেবার কথা তিনি ভাবছিলেন, এবার ঠিক করলেন আর একটু অপেক্ষা করা যাক। এ ছেলে যেমন ভাবে উঠছে তাতে বিড়লা বা খৈতান বা জৈনদের বাড়ি থেকেই অশোককে জামাই করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে নিশ্চয়ই।

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশোক অবশ্য এর মধ্যে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে রক্ষিতা করেছে, বাইরে অবশ্য তার পরিচয় অফিস সেক্রেটারি।

তারপর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটলো।

জুলাই মাসের এক শনিবার অশোক জরুরি কাজে রাঁচী থেকে খড়্গপুর আসছিল গাড়িতে। এখন অশোক নিজে গাড়ি চালায় না, ড্রাইভার থাকে। আর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীও থাকে সব সময়, সে আসলে তার বডি গার্ড।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সকাল থেকেই, সেই জন্য গাড়ির গতি একটু

ধীর। পেছনের সীটে বসে অশোক ব্যবসার কাগজ-পত্র পড়ে যাচ্ছে। একটা হাত তার রক্ষিতা বনাম সেক্রেটারি স্টেলার উরুর ওপর রাখা। স্টেলা অবশ্য ঢুলছে অনেকক্ষণ ধরে।

বাহারাগোড়ার একটু আগে দেখা গেল রাস্তার ওপরে বেশ ভিড়। দুপাশে অনেক গাড়ি জমে গেছে। একটা পুলিসের গাড়িও দেখা যাচ্ছে।

কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে অশোক জিজ্ঞেস করলো, ক্যা হুয়া?

ড্রাইভার বলল, অ্যাকসিডেন্ট মালুম হোতা।

বিরক্তিতে অশোকের ভুরু কুঁচকে গেল। লাঞ্চের আগেই তার খড়্গপুরে পৌঁছোনো দরকার। কিন্তু রাস্তা এমন জ্যাম হয়ে আছে যে গাড়ি এগোবার কোনো উপায় নেই।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অশোক গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। স্টেলা ঘুমিয়েই রয়েছে। অল্প অল্প বৃষ্টি এখনো পড়ছে, তার মধ্যেও এত লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হাইওয়ের ওপরে এত মানুষ আসে কোথা থেকে? অশোক এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

বেশ বড় রকম দুর্ঘটনা। একটা ট্রাক রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে পাশের শাল গাছে। একটা সাদা রঙের ফিয়াট গাড়ি ত্যারছা ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফিয়াট গাড়িতে চাপা পড়েছে এক গ্রাম্য মহিলা আর একটি বাচ্চা মেয়ে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় এরকম দুর্ঘটনার কোন কারণই নেই, কিন্তু ফিয়াট গাড়ির ড্রাইভার নাকি ঘুমে ঢলে পড়েছিল।

ডেড বডি দুটো এখনও সরানো হয়নি, রাস্তার পাশে চাপ চাপ রক্ত বৃষ্টির জলেও ধুয়ে যায় নি। ঝাড়গ্রাম থেকে অ্যাম্বুলেন্স আসবে, সেই জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার পর ফিয়াট গাড়িটি পালাতে পারেনি, কারণ তার ব্রেক জ্যাম হয়ে গেছে। ঘটনাটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে পড়েছিল বলে উত্তেজিত জনতা মারধোর বা ভাঙচুরের তাণ্ডব শুরু করতে পারেনি। অবশ্য এরা শহরের জনতা তো নয়, তাই চট করে হিংস্র হয় না। ফিয়াট গাড়িটিতে শুধু চালক ছাড়া আর কেউ ছিল না, সেই চালকটি পুলিশের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

এই দুর্ঘটনার দৃশ্যটি অশোকের মনে প্রথমে কোন দাগ কাটেনি। সে খালি অস্থির হয়ে ভাবছিল, খড়্গপুর পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, ব্যবসার কাজে লোকসান হয়ে যাবে, পুলিশ তো আগে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিলেই পারে।

ফিয়াট গাড়ির চালকটি একবার মুখ ফেরাতেই অশোক তাকে ভাল করে

দেখতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে কামানের গোলার মতন প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। একী? লোকটিকে অবিকল অশোকের মতন দেখতে। একরকম উচ্চতা, একরকম গায়ের রং, নাক-চোখেরও দারুণ মিল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে কথা বলছে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে।

তিনটি গাড়ির চালকটির মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। দেখলেই বোঝা যায় সে যথেষ্ট অর্থবান। সে টাকা পয়সার জন্য উড়িয়ে ধরলেই পুলিশ থেকে আরম্ভ করে আর সবাই তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে।

কিন্তু অশোক অহেতুক ভাবে সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল, যদি জনতা তাকে ঐ লোকটির যমজ ভাই মনে করে? সবাই মিলে যদি তেড়ে আসে তার দিকে? কেউ অশোককে লক্ষ্য করছে না, তবু অশোক দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে নেমে গেল রাস্তার পাশের নালায়। তারপর অশোক আর আগের অশোক রইল না।

সে ভুলে গেল খড়্গপুরে তার জরুরী কাজের কথা, তার গাড়ির কথা, শৈলার কথা। তার নাম যে অশোক তাও বোধহয় আর তার মনে নেই।

নালাটা পেরিয়ে সে চলে গেল ওপারে। তারপর একটা ছোট শালের জঙ্গল। অশোক সেই জঙ্গলে ঢুকে ছুটতে লাগল। এখন সে খালি শুনতে পাচ্ছে বড় বড় শব্দ। কতকগুলো ধারাল নখযুক্ত আঙুল যেন তার মাথাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে। সে ফিরে গেছে তার সতেরো বছর বয়েসে, সে যেন মোমিনপুরের মোড় থেকে আর গাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে, দু'একবার দম নিয়ে প্রায় আড়াই ঘন্টা পর অশোক এক জায়গায় এসে একেবারে থামল। সেখানে আদিবাসীদের একটা হাট বসেছে। একটা খেজুর গাছের তলায় বসে অশোক হাঁপাতে লাগল জিভ বার করে। তার খালি এখন একটাই ইচ্ছে করছে, কোনক্রমে মায়ের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু মায়ের কাছে কী করে পৌঁছনো যায় তা আর অশোক এখন জানে না। প্রায় বছর দেড়েক হল সে তার মাকে একবার চোখেও দেখেনি।

একটু পরে একজন আধা মাতাল ভিখিরি এসে অশোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এ বাবু, একঠো রুপিয়া দিবি?

অশোক কোনদিন ভিখিরিদের পয়সা দেয়নি, কিন্তু আজ সে কোটের পকেটে হাত ঢোকাল। তার কাছে টাকা পয়সা কিছু নেই। বড়লোকরা সঙ্গে টাকা রাখে না, তাদের থাকে চেক বই, ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড ইত্যাদি। খুচরো দু-পাঁচশো টাকা অশোক তার বডি গার্ডের কাছে রাখে সব সময়।

ভিখিরিটিকে পয়সা দিতে পারল না অশোক, কিন্তু তার হাতঘড়িটা খুলে দিল। যেন এখন সে এই ঘড়িটার কোন মূল্য বোঝে না। লোকটা নির্বিবাদে ঘড়িটা নিয়ে জুয়া খেলার বোর্ডের দিকে নিয়ে গেল। ওখানে ঘড়ি জড়িয়ে টাকা পাওয়া যায়।

এরপর আর একটি লোক এসে হাত পাতল তার কাছে। অশোকের বাঁ হাতে দুটো আংটি, দুটোই খুলে সে দিয়ে দিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ওর হাত থেকে কেড়ে নিল একটা।

তারপর রটে গেল যে একটা বাবু যা চাওয়া হচ্ছে, তাই দিয়ে দিচ্ছে। ধেয়ে এল আরও অনুগ্রহ প্রার্থীরা। যেহেতু অশোক সব জিনিসেরই মূল্য ভুলে গেছে, তাই সে দিয়ে দিতে লাগল সব কিছু। তার সিগারেট কেস, লাইটার, তার কোট, সার্ট, এমনকি প্যান্টলুন পর্যন্ত।

এরও পরে একজন উলঙ্গ লোক এসে বলল, এ বাবু, আমায় কিছু দিবি না?

শুধু জাঙিয়া ছাড়া অশোকের আর কিছু নেই। সেটাও সে খুলে দিল বিনা দ্বিধায়। তারপর সে আর বাবু শ্রেণীতে রইল না। জল-কাদার মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একজন জংলী মানুষ হয়ে গেল।

বিকেল যখন শেষ হয়ে এসেছে, হাট ভাঙবার মুখে কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল তাকে। প্রথমে তারা ভেঙচি কাটতে লাগল, তারপর অশোকের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে তারা ছুঁড়তে লাগল ছোট ছোট ঢিল, কেউ কেউ লাথি মারতে লাগল তার গায়ে।

প্রয়াগের মেলায় সম্রাট অশোক সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ধর্মাশোক হয়েছিলেন। আর এখানে, এই নাম না জানা আদিবাসীদের হাটে অশোক একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েও, সাধারণ পাগলের ভাগ্যে যা জোটে তাই ভোগ করতে লাগল।

খুব ভালোবাসা

নিরালায় দেখা করাই তো মুস্কিল!

এমনিতেই বাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন, তার ওপর দিল্লি থেকে এক মাসি এসেছেন, তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে সিঁড়ি দিয়ে সব সময় উঠছে নামছে। এই অচেনা দুরন্ত কিশোর-কিশোরীদের পাল্লায় পড়ে এ বাড়ির পোষা কুকুরটার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। বাড়ির তিনতলা থেকে কেউ একজন ডাকে রতন, রতন! একতলা থেকে লম্বা উত্তর আসে, যা-ই! দিদিব মেসোমশাই একবার হাঁচতে শুরু করলে বাইশবার হাঁচেন। বসবার ঘরে সবাই গুনে থামিয়ে গোনে, ষোলো, সতেরো, আঠেরো...।

এরই মধ্যে অম্বিতার অসুখ। গত মঙ্গলবার ছিল অম্বিতার আঠেরো বছরের জন্মদিন, তার আগেই রবিবার সন্ধ্যেবেলা তার জ্বর এলো। বিকেলবেলা থেকেই সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল তার মুখ থেকে হাসিটা ফ্যাকাশে, নিজেই গিয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। জ্বর মানে একেবারে খুব জ্বর! সোমবার দুপুরে টেম্পারেচার উঠলো একশো ছয় পয়েন্ট আট।

রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, ম্যালেরিয়া নয়, টাইফয়েড নয়। এ এক অদ্ভুত জ্বর, যা থার্মোমিটারের টং-এ চড়ে বসে থাকে। জ্বরের ঘোরে প্রায় অজ্ঞানের মতন অবস্থা। ঠাণ্ডা জল দিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ধুইয়ে দিলে অম্বিতা চোখ মেলে তাকায়, এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে যেন সে কাকে খোঁজে। কিছুই খেতে চায় না সে।

অম্বিতার নিজের মামাই বেশ বড় ডাক্তার। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার দরকার নেই, বাড়িতেই থাকুক।

সাতদিন কেটে গেলেও যদি জ্বর না নাবে তখন দেখা যাবে। আজ ছ'দিন হলো।

শুভ্র প্রত্যেক দিনই আসে। এর মধ্যে দু'বার সে অম্বিতাকে দেখতে গিয়েছিল, দু'বারই অম্বিতার বিছানার পাশে তিন চারজন লোক ছিল। অম্বিতার চোখ দুটি ছিল বোজা, শুধু ঠোঁট একটু কেঁপে যাচ্ছিল। অম্বিতা জানতেও পারেনি শুভ্র এসেছিল কিনা। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছিল অম্বিতার, কেউ সরিয়ে দেয়নি।

এ বাড়িতে শুভ্রর যখন তখন আসতে কোনো বাধা নেই। সে যদি একা সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় অম্বিতার ঘরে কখনো চলে আসে, কেউ কিছু মনে করবে না। শুধু শুভ্রর লজ্জা করে। সে তো এ বাড়িতে আদিত্যর বন্ধু হিসেবে আসে, সবাই তাই জানে। এর আগে এমন অনেকবার হয়েছে, বসবার ঘরে আদিত্য আর ওদেরই সমবয়েসী আর কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা মারছে শুভ্র, সেই সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অম্বিতা ডেকেছে, এই শুভ্রদা, শোনো! শুভ্র দরজার কাছে এসে আরক্ত মুখে বলেছে, কী? অম্বিতা বলেছে, তুমি ওপরে আমার পড়ার ঘরে এসো, তোমায় একটা মজার জিনিস দেখাবো! শুভ্র সে কথা শুনেই সঙ্কুচিত হয়ে যায়, চট করে একবার পেছন ফিরে বলে, কেন? অম্বিতা সরল স্বাভাবিক-ভাবে বলে, এসোই না, এত কি আড্ডা...। শুভ্র তবু জড়তা কাটাতে পারে না, খুব মৃদু গলায় বলে, এখন না, থাক, পরে এক সময়...।

অম্বিতা অভিযোগ করেছে, তোমার এত কিসের লজ্জা বলো তো? আমার পড়ার ঘরে তুমি এসে একটু গল্প করলে তোমায় কি কেউ বকবে?

শুভ্র উত্তর দিতে পারে না।

—মেয়েরাও তোমার মতন লজ্জা পায় না। দ্যাখো তো, সৌম্যদা...

সৌম্য অম্বিতার আর এক দাদার বন্ধু। ওদের চেয়ে মাত্র তিন চার বছরের বড়। বড় আমুদে যুবক। সে এ বাড়িতে এলেই একটা হৈ চৈ জাগিয়ে তোলে, যে-কোনো ঘরে চলে যায়, ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় অম্বিতা কিংবা নন্দিনীর মাথায় চাঁটি মারে, কিংবা বুকের কাছে টেনে আনে, সব কিছুই অতি সাবলীল।

শুভ্র হাজার চেষ্টা করলেও সৌম্যদার মতন হতে পারবে না। কেন যে তার এত লজ্জা তা সে নিজেই জানে না।

কিন্তু এখন, অম্বিতার এত অসুখ, শুভ্র একবার তার শিয়রের কাছে দাঁড়াবে না, তার কপালে একটু হাত রাখবে না?

রাত্রে শুভ্রর ঘুম আসে না। ভোরবেলা প্রথম কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, এক্ষুনি অম্বিতার বাড়িতে গেলে হয় না? ছ'দিন ধরে ভালো করে

জ্ঞানই ফিরছে না, এ কী ধরনের কঠিন অসুখ? দুপুরবেলা কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে শুভ্রর মনে হয়, এখন বোধহয় জয়িতার ঘরে কেউ থাকবে না! কিন্তু এই দুপুরে... আদিত্যকে না ডেকে সে একলা একলা যাবে, যদি জয়িতার দিদির মাসি কিছু মনে করেন?

সপ্তম দিন সন্ধ্যেবেলা শুভ্র একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেললো। ব্যাডমিন্টন খেলে ফেরবার পর আদিত্যদের সঙ্গে একতলার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে, এমন সময় শুভ্র দেখলো, জয়িতার বাবা, ডাক্তার মামা, দিদির মেসো সবাই কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের গেটের দিকে এগোচ্ছেন। অমনি শুভ্রর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

বাথরুম থেকে আসছি, বলেই সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। একতলাতেও বাথরুম আছে, দোতলাতেও আছে, শুভ্র উঠে এলো তিনতলায়। ডাক্তার দেখে যাবার পরেই খানিকক্ষণ রোগীর ঘর খালি থাকে, শুভ্র লক্ষ্য করেছে অনেকবার।

জয়িতার ঘরের দরজাটা আলতো করে ভেজানো, একটুখানি ঠেলে সে ফাঁক করলো শুভ্র। তারপরই সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। জয়িতার মা-মাসিমা কেউ নেই যদিও, কিন্তু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক বয়স্কা মহিলা। জলপট্টি ভিজিয়ে দিচ্ছেন, এই মহিলাকে জয়িতারা বোষ্টমদিদি বলে ডাকলেও আসলে এঁকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ির কাজের জন্য, ঝিয়ের চেয়ে একটু ওপরে এঁর স্থান। এই মহিলাকে দেখেও শুভ্রর লজ্জা!

কিন্তু মহিলাটিই একটা সুবিধে করে দিলেন, তিনি শুভ্রকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে।

শুভ্রর হাতে বেশি সময় নেই, সে দ্রুত চলে এলো খাটের পাশে।

এখনো চোখ বুজে আছে জয়িতা। মুখখানা কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের মতন, ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব, একটা হাত বুকে, একটা হাত বিছানার বাইরে ঝুলছে। বিছানার চাদরটা এত ধপধপে সাদা, যেন শূন্যতা, হাওয়ায় ভাসছে জয়িতার আঠেরো বছরের ভারশূন্য শরীর।

শুভ্র কি ডেকে ওর ঘুম ভাঙাবে? সেটা ভালো না খারাপ? শুভ্রর বেশি সময় নেই। একবার অন্তত কপালে হাত রেখে...।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালো জয়িতা। কোনো বিস্ময় নেই, অভিমান নেই, ঠিক যেন ঝর্না থেকে তোলা দু' চামচ জল।

অতি ব্যস্তভাবে শুভ্র বললো, আমি আগে দু'বার এসেছিলাম, সত্যি এসেছিলুম, বিশ্বাস করো।

জয়িতা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করলো, শুভ্র, আমি কি মরে যাচ্ছি?

—না, না, তোমার সে রকম কিছু তো হয়নি।

—আমি ডুবে যাচ্ছি, অনেক নীচে, অনেক, অনেক, মনে হয় আর আমি ফিরে আসতে পারবো না। এই রকম ভাবেই তো মানুষ মরে যায়।

—যাঃ, কী আজেবাজে কথা বলছো! তোমার মামা এই একটু আগেই বলছিলেন, কালই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

—ওরা কেউ কিছু জানে না।

হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করে, শুভ্রর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, শুভ্রর মুখের দিকে অতি তীব্রভাবে তাকিয়ে জয়িতা ফিসফিস করে বললো, আমায় সত্যিই তুমি ভালোবাসো? খুব, খুব ভালোবাসবে? বলো? খুব ভালোবাসবে? তা হলে আমি বেঁচে উঠবো!

শুভ্রর উত্তর দেওয়া হলো না। দরজা হাট করে খুলে ঢুকলেন দিদির মাসি। শুভ্র একেবারে কেঁপে উঠলো। মাসি কিন্তু শুভ্রকে একেবারে গ্রাহ্যই না করে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, তুই কিছুই খাচ্ছিস না খুকি, এ-রকম করলে চলবে কী করে বলতো? এই তো মেজদা বলে গেল—

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো শুভ্র। তার মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ সে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে।

নিচের ঘরে ফিরে আসার পর কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো না সে কোথায় গিয়েছিল। তবু শুভ্র একেবারে স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার গলার মধ্যে যেন ঢুকে গেছে একটি ব্লটিং পেপার।

একটু বাদে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে বেভুলভাবে হাঁটতে লাগলো। জয়িতা তাকে একটা সাঙ্ঘাতিক শক্ত দায়িত্ব দিয়েছে। মাথা ঘুরছে শুভ্রর। খুব ভালোবাসা! তার মানে কী? কতখানি ভালোবাসলে খুব ভালোবাসা হয়?

এখন বাড়ি ফেরা অসম্ভব! অন্য কারুর সঙ্গে শুভ্র এখন কথা বলতে পারবে না। কোথায় যাবে তা হলে? শুভ্র ঠিক হাঁটছে না, প্রায় দৌড়োচ্ছে এখন। জয়িতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব এখন তার ওপর। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তাকে আজই বুঝে নিতে হবে, এত বড় দায়িত্ব নেবার সে যোগ্য কিনা!

এক সময় রাস্তার পাশে একটা পার্ক দেখে শুভ্র লোভীর মতন তার মধ্যে ঢুকে পড়লো। বেঞ্চিগুলো সব ভর্তি, ঘাসের ওপরেও কিছু লোক, শুভ্র একটা অন্ধকার মতন কোণ দেখে সেখানে বসলো পা ছড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ভেসে উঠলো, জয়িতার সেই ব্যগ্রভঙ্গি...।

জয়িতা বলেছে, ওরা কেউ কিছু জানে না। জয়িতার কথাটা ছেলেমানুষি

বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডাক্তার, ওষুধ ছাড়া, যার অসুখ, তার মনের জোরেই রোগ অনেকটা সেরে যেতে পারে। জয়িতা একটা শর্ত দিয়েছে, তাকে যদি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তো সেরে উঠতে চাইবে। শুভ্র পারবে না সেই শর্ত পূরণ করতে ?

খুব ভালোবাসা ! কত মানুষ কত মানুষকে ভালোবাসে, তারা সবাই কি পরস্পরকে খুব ভালোবাসে ? শুভ্র যতখানি ভালোবাসে, তা কতটা ? অন্যের বাড়ির বাইরের ঘরে অনেকের সামনে জয়িতা এসে ডাকলে শুভ্র তার সঙ্গে যায় না, সেটা তার লাজুকতা, কিন্তু একদিন মনোহরপুকুর মোড়ে জয়িতাকে একা একা হাঁটতে দেখেছিল শুভ্র, সে তখন একটা চলন্ত বাসে, সে তো জয়িতাকে দেখে পরের স্টপে নেমে পড়েনি, তার খুবই ইচ্ছে করেছিল ঠিকই তবু নামতে পারেনি, সেদিন ইন্টার কলেজ ডিবেট কমপিটিশন, শুভ্রর দেরি হয়ে গিয়েছিল...সেটা কি শুভ্রর স্বার্থপরতা ? যারা খুব ভালোবাসে, তারা এরকম চলে যায় ? ঘটনাটা অবশ্য গোপন করেনি শুভ্র, পরের দিনই জয়িতাকে বলেছিল। জয়িতা রাগ করেনি, কী রকম ভাবে যেন হেসে বলেছিল, তুমি ভারি অদ্ভুত বাবা ! সে কথার কী যে মানে তা শুভ্র আজও জানে না !

কোনোদিন কি শুভ্র এমন কিছু করেছে যা দেখে বোঝা যায় যে সে জয়িতাকে খুব খুব ভালোবাসে ? শুভ্রর যতদূর মনে পড়ে, যতবার দেখা হয়েছে, জয়িতাই অনেক বেশি করে তার মন ভরিয়ে দিয়েছে ! একটা নীল সেঞ্জি...শুভ্রর তখন দশ-এগারো বছর বয়েস, সেবার বেনারসে থাকা হয়েছিল দু' মাস, ওদের বাড়ির কাজের ছেলেটি সেই নীল গেঞ্জিটা কাচতে গিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ওটা ছিল শুভ্রর দারুণ প্রিয়, শুভ্র একেবারে কেঁদে কেটে অস্থির, কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গিয়েছিল...। সেই জামাটাকে যতখানি ভালোবাসতো শুভ্র ততখানি কি জয়িতাকে...অবশ্য জয়িতা তো হারিয়ে যায়নি...। যায়নি, যেতে তো পারে। এই রকম একরোখা জ্বর। হয়তো কোনো ভাইরাস ইনফেকশন— কিন্তু এর মধ্যে তো একদিনও শুভ্র সেরকম ব্যাকুল হয়নি, এমনকি আজ বিকেলে পরপর তিন গেম ব্যাডমিন্টন খেলেছে !

শক্ত করে তার হাতটা চেপে ধরেছিল জয়িতা, শুভ্র সেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছিল, কোনো উত্তর দিতে পারেনি তার কথার। দিদির মাসি এসে পড়েছিলেন বলেই নয়, কী উত্তর দেবে ? খুব ভালোবাসা ! জয়িতা কি নিছক স্তোকবাক্য শুনতে চেয়েছিল ? জয়িতা খুব বুদ্ধিমতী, অত জ্বরেও তার বোধ নষ্ট হয়নি, ডাক্তার মামার উদ্বেগ শুনে বলেছিল, ওরা কেউ কিছু জানে না।

খুব ভালোবাসা মানে কার মতন ? সত্যে...। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান,

লখীন্দর-বেহুলা, রাধা-কৃষ্ণ, শকুন্তলা। আর...আশ্চর্য, এই সব গল্পগুলোতে মেয়েরাই তো শুধু ভালোবেসেছে, আর ছেলেগুলো যেন সব পাথর, কৃষ্ণ কী রকম রাধাকে ছেড়ে চলে গেল ! ধুৎ, বাজে। শুধু মেয়েরাই বুঝি ভালোবাসতে জানে। কেন, রোমিও জুলিয়েট, সেখানে দু'জনেই সমান ! তবে, দু'জনেই মরে গেল, না, না, এই রকম সময় মৃত্যুর কথা ভাবা ঠিক নয় !

পাওয়া গেছে ! জয়িতার ছোড়দা আদিত্য কতখানি ভালোবাসে জয়িতাকে ? হ্যামলেটে একটা চমৎকার কথা আছে, ওফেলিয়ার ভাইকে হ্যামলেট রেগে গিয়ে বলছে, দশ হাজার ভাইয়ের ভালোবাসার চেয়েও ওফেলিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসা বেশি। দশ হাজার আদিত্যর ভালোবাসার চেয়েও আমি, আমি, আমি শুভ্র মজুমদার, আমার ভালোবাসা অনেক বেশি। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু ওফেলিয়া মরে গিয়েছিল ! হ্যামলেটের খুব, খুব ভালোবাসাও তো...শুভ্র আজ কিছুতেই ওকথা ভাববে না।

কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর শুভ্র ইন্টার কলেজ ডিবেট কমপিটিশনের জন্য জয়িতাকে দেখতে গেয়েও...না, এ তুলনায় মোটেই কোনো মানে হয় না। চলে যেতে হয়েছিল বটে কিন্তু সে জন্য শুভ্রর যে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল সেটা বুঝি কিছু না ? কষ্ট মানেই কি ভালোবাসা ? কষ্ট মানে স্বার্থপরতা নয় ?

হঠাৎ ঠাকুমার কথা মনে পড়লো শুভ্রর। দু'বছর আগে মারা গেছেন। বারুইপুরে থাকতেন, একটা ঠাকুরঘর ছিল, সেখানে সকালে জপ করতে গিয়ে ঠাকুমা একটা রামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতেন। শুভ্র একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কাঁদো কেন ঠাকুমা ! ফোকলা মুখে অনাবিল হাসি হেসে ঠাকুমা বলেছিলেন, এমনি রে, এমনি। উত্তরটা শুনেই শুভ্রর বুকটা তোলপাড় করে উঠেছিল। ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে হয়েছিল। কতকাল আগে মারা গেছেন রামকৃষ্ণ, তবু তাঁর জন্য ঠাকুমা কাঁদতেন, এটা নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ! খুব ভালোবাসা ! শুভ্র কি অতখানি ভালোবাসতে পারে জয়িতাকে ?

কিংবা...একটা সন্দেহ খোঁচা মারলো শুভ্রকে,...ঠাকুমা অনেকদিন বিধবা... ছেলেমেয়েরা দূরে দূরে থাকে...বারুইপুরে প্রায় একা একা থাকতেন নিজের সেই দুঃখের কথা ভেবেই কাঁদতেন একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ?

শুভ্রর বাবা শুভ্রর মাকে সেরকম, সেটাও কি...। এই চিন্তাটা শুভ্র তৎক্ষণাৎ মন থেকে মুছে ফেললো। এই বয়েসে শুভ্রর এইটুকু অন্তত জ্ঞান হয়েছে যে বাবা-মায়েদের ব্যক্তিগত জীবন ছেলেমেয়েরা কোনোদিন ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না।

মিলনদা আর অলকাবৌদি? ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে অলকাবৌদির মাথায় চোট লাগলো, তারপর থেকে পাঁচ-ছ বছর তো হয়ে গেল, মিলনদা কী রকম ভাবে অলকাবৌদির সেবা করে যাচ্ছেন। সবাই মিলনদার নাম শুনলেই ধন্য ধন্য করে। এটা নিশ্চয়ই একটা খুব-ভালোবাসা।

যুক্তিহীনভাবে শুভ্রর চোখে হঠাৎ জল এসে গেল হু হু করে। সবাই পারে না, সবাই খুব, খুব ভালোবাসতে পারে না। শুভ্ররও বোধহয় সে রকম ক্ষমতা নেই! সে দুর্বল। আজ থেকে আগামী ছ' বছর জয়িতা যদি এই একই রকম অসুখে ভোগে, তাহলে শুভ্র কি একই রকম টানা এই ছ' বছর ধরে জয়িতার জন্য ব্যাকুল থাকতে পারবে? অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব করবে না, ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে না? এখানে কেউ নেই, এখানে কেউ তাকে দেখছে না, এখানে তো নকল ভাব দেখিয়ে লাভ নেই! শুভ্র বড় [illegible], সে জোর দিয়ে বলতে পারবে না যে সে মিলনদার মতন পারছে। রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প সিনেমা হয়েছিল, মালঞ্চ না দুই বোন, তাতেও তো স্বামীটা পারেনি। মিলনদার ব্যাপারটাও কি শুধু ভালোবাসা, না দায়, না করুণা, না সবাই ভালো বলবে বলেই...ছি ছি, এরকম কথা তো শুভ্রর আগে কখনো মনে আসেনি! না না, মিলনদা তার চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ। সবাই পারে না, কেউ কেউ পারে। ভালোবাসাও কবিতা লেখার মতন।

ভালোবাসা আর খুব-ভালোবাসার মধ্যে দূরত্ব কতখানি? শুভ্র তার ভালোবাসার কথা জানে, কিন্তু ভালোবাসা মাপতে জানে না। জয়িতা তার শুধু ভালোবাসা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, খুব-ভালোবাসা চায়। কথাটা সে দু'তিনবার বলেছে। জ্বরের ঘোরে নিশ্চয়ই জয়িতার মনে হয়েছে যে শুভ্র তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না।

চোখের জল পড়ছে তো পড়ছেই, রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রুমাল ভিজে গেল, তবু অশ্রু থামে না। এ এক ব্যর্থতাবোধের তীব্র বেদনা। শুভ্র হেরে গেল! সে জয়িতাকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু নতুন পাহাড়ের চূড়ায় পতাকা উড়িয়ে দেবার মতন খুব-ভালোবাসা তার ক্ষমতার বাইরে। কী আর করা যাবে। সবাই তো সব কিছু পারে না।

চোখ মুছে, ধীর শান্ত পায়ে শুভ্র এলো বড় রাস্তায়। বাসে চেপে বাড়ি ফিরলো। খাওয়া-দাওয়া করলো, বাড়িতে কেউ কিছুই সন্দেহ করলো না তাকে। সবই অন্যদিনের মতন। নতুন শীত পড়েছে, পার্কে বসে ঠাণ্ডা লেগে গেছে বলে শুভ্র কাশলো কয়েকবার। বাড়ির সবাই জানে, শুভ্র অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে গল্পের বই পড়ে, আজ রাতে শুভ্র আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো

তাড়াতাড়ি।

রাত্তির দেড়টা আন্দাজ, সারা বাড়ি এবং পাড়া যখন ঘুমন্ত, তখন শুভ্র চুপিসারে বেরিয়ে পড়লো আবার। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো জয়িতাদের বাড়ির সামনে। এ বাড়িতেও কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। তিনতলায় জয়িতার ঘরের জানলা বন্ধ।

একটু দূরে মোড়ের মাথায় মুখার্জিদের বাড়ির সামনে বেশ চওড়া রক। কয়েকজন ভিখিরি ঘুমোয় এখানে। তাদের পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলো শুভ্র। সে সঙ্গে একটা চাদর এনেছে, শীতে কষ্ট পাবে না। আজ সপ্তম দিন, কাল নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবে জয়িতার জ্বর। সকালে গীতার কাটার নাম করে সে আদিত্যকে দিয়ে ডাকবে। তখনই নিশ্চয়ই সে আদিত্যর কাছে জেনে যাবে যে জয়িতার অসুখ কমে গেছে।

তারপর কোনো একদিন সে জয়িতার কাছে এসে বলবে, আমায় ক্ষমা করো! খুব-ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমি পারিনি! আমি দূরে চলে যাচ্ছি!

আর কোনোদিন জয়িতার সঙ্গে তার একলা দেখা হবে না।

ভাঙা বারান্দা

এমন নয় যে এই বারান্দাটায় দাঁড়ালেই সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখা যায়। তবু তো বারান্দা। জানলার থেকে অনেকখানি বেশি। জানলার গরাদে মুখ রাখলে কয়েদীর মতন লাগে, আর বারান্দা মানে মুক্তি।

বারান্দা একটা আছে, কিন্তু সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই।

যতদিন ছেলেটা ছোট ছিল, ততদিন বারান্দার দিকে দরজাটা বন্ধ করে রাখতে হতো সব সময়। এখন ছেলে ইস্কুলে গেলে অসীমা দরজাটা খোলে, উদাস মুখ করে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে, কিন্তু বাইরে পা বাড়াতে পারে না।

বারান্দাটার রেলিং ভেঙে পড়েছিল আট বছর আগে। তাতেও এমন কিছু ক্ষতি ছিল না, বরং লোকেরা সাবধানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের ফেরিওয়ালাদের ডাকতে পারতো। কিন্তু একদিন দেখা গেল বারান্দাটার মাঝখান থেকে ফেটে অনেকখানি হাঁ হয়ে গেছে। ওপরের সিমেন্ট ঝুরঝুরে। মাঝে মাঝেই সুরকি খসে পড়ে নিচে। ঐ বারান্দা এখন আর একজন মানুষের ভারও সহ্য করতে পারবে না। তবু সুদর্শন সাহস করে একদিন পা দিতেই বেঁকে গিয়েছিল।

সেই আট বছর আগেই ঐ বারান্দা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সুদর্শন। তখন সুদর্শনের চেহারা ছিল রোগা পাতলা, ডায়াবিটিস ধরে নি। মেজাজটাও ছিল তেজী। কিন্তু উগ্র স্বভাবের মানুষরাও চুনীলাল শীলের মতন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোন সুবিধে করতে পারে না। কোনো গালাগালিই চুনীলাল শীলের গায়ে লাগতো না। ঠাণ্ডা গলায় বলতো, বারান্দা সারাবো, সে পয়সা পাবো কোথায়? দেখছেন না স্ত্রী পুত্র নিয়ে ডুবতে বসেছি। আপনার না পোষায় আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন।

পাশের ঘরে থাকতেন গুরুপদবাবুরা। বারান্দাটায় তাঁদেরও কিছুটা অংশ

ছিল। গুরুপদবাবুর স্ত্রীকে অসীমা কাকীমা বলে ডাকতো। বেশ ভাব ছিল দুটি পরিবারে। অসীমা অবশ্য জানে না যে ঐ গুরুপদবাবুর মেয়ে বুলা এক সময় সুদর্শনকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সুদর্শন রাজি না হয়ে দু' পক্ষেরই বাবা মায়েদের খুশি করেছিল। বিয়ে করার মতন কোনো যোগ্যতাই ছিল না তার।

গুরুপদবাবু সুদর্শনকে ঐ বারান্দা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বুঝলে খোকন, ভাড়াটে হিসেবে কি আমাদের কোনো অধিকার নেই? বারান্দা সমেত ঘর ভাড়া নিয়েছে, এখন সেই বারান্দা যদি ভেঙে পড়ে, বাড়িওয়ালা তা সারাতে বাধ্য নয়? থানায় খবর দিতে হবে, দরকার হলে আমরা কেস করবো?

সে বছরই সুদর্শনের বাবা মারা গেলেন, পয়সা-কড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, মামলা মোকদ্দমার নামে তার ভয় হয়েছিল। সে তো অনেক টাকার ব্যাপার, সে আর গা করে নি।

বাড়ি ফিরতে সুদর্শনের বেশ রাত হয়। তাদের এ পাড়াটা বিশেষ ভালো নয়, কাছেই পোস্তার বাজার, সারাদিনরাত সেখানে অনেক টাকার কারবার চলে সেখানে গুণ্ডা বদমাসরাও সবসময় ঘুর ঘুর করে। রাত্তিরের দিকে ছিনতাই আর ছুরি চালাচালি লেগেই আছে। অবশ্য এ পাড়ার সবাই সুদর্শনকে চেনে। এ পাড়াতেই তার জন্ম। সে একটা সাধারণ হেঁজিপেঁজি মানুষ। গুণ্ডা বদমাসরা তাকে ছোঁবে কেন?

অসীমা তবু ভয় পায়। সুদর্শন ফেরার আগে রাস্তায় কোন একটা গোলমাল হলেই সে বারান্দার দিকের দরজাটা খোলে, কিন্তু বাইরে কী ঘটছে তা দেখবার উপায় নেই।

এক একদিন সুদর্শনের ওপর রাগ করে অসীমার ইচ্ছে করে ঐ রেলিং ছাড়া বারান্দাটাতেই গিয়ে দাঁড়াতে। ভেঙে পড়ে তো পড়ুক।

সুদর্শন ফিরলেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে, আমি আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে চাই না। তোমার দোকানের কাছাকাছি একটা বাড়ি নিতে পারো না?

ম্লান হাসি ছাড়া এ কথার কোনো উত্তর নেই। দোকানের কাছাকাছি বাড়ি, অসীমা বোঝেই না, কত ধানে কত চাল! বর্ধমানের গ্রামের মেয়ে অসীমা, তাই মনটা এখনো সাদা!

কারখানায় যখন লক আউট চলছিল তখন কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলে কালীঘাটের মোড়ে রাস্তার ওপর ছিট কাপড়ের দোকান খুলেছিল সুদর্শন। সে কারখানা আর কোনদিন খুললোই না। অন্য চাকরির চেষ্টা না করে সুদর্শন এ দোকান নিয়েই লেগে রইলেন। মোটামুটি বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে

এই পাতাল রেলের জন্য রাস্তা খুঁড়ছে ঐ দিকে, এখন শোনা যাচ্ছে যে কোনদিন ফুটপাথের দোকানগুলো সব তুলে দেওয়া হবে। তখন আবার জায়গা পাওয়া যাবে কোথায় ?

আর বাড়ি পালটানো ? সুদর্শনের বাবা ছত্রিশ বছর আগে এ বাড়িতে দেড়খানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাড়া বাড়তে বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে চুয়াত্তর টাকা। এই ঘর ছেড়ে অন্য যে কোন জায়গায় এরকম দেড়খানা ঘর ভাড়া নিতে গেলে অন্তত সাড়ে তিন শো, চারশো টাকা লেগে যাবে।

অসীমা ভাত বেড়ে দেয়। অসীমার দিকে তাকিয়ে সুদর্শনের বড় মায়া লাগে। সারাদিন তার দোকানে অনেক রকম মেয়েছেলে আসে, তাদের কত রকম চেহারা, কেউ কেউ তো বেশ সুন্দরী, তবু রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে নিজের বউকে দেখতেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সুদর্শনের। তার কোনো উঁচু আকাঙ্ক্ষা নেই। সারাদিন খাটাখাটনির পর যদি বিক্রিবাটা মোটামুটি ভালো হয় তাতেই সে খুশি। আর রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বউয়ের সঙ্গে একটু গল্প করা।

কিন্তু প্রত্যেকদিনই অসীমার অনেক অভিযোগ জমা থাকে।

সুদর্শন বলে, দাঁড়াও না, আগে একটা পাকা দোকান ঘরের ব্যবস্থা করি, তারপর বাড়ি পাল্টাবো ঠিকই। একটা সুন্দর বারান্দা থাকবে, বেশ পার্কের পাশে, ছেলেটা খেলতে পারবে....।

পাশের ছোট ঘরটা থেকে গোঙানির শব্দ পাওয়া যায়। সুদর্শনের মায়ের বয়েস হয়েছে অনেক, শরীরে শক্তি নেই, এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। কিন্তু এইসব মানুষের মৃত্যু সহজে আসে না। কোনো রাত্তিরেই মায়ের সঙ্গে দেখা করে না সুদর্শন। বাড়ি ফেরার পথে এক একদিন তার আশা হয়, ফিরেই হয়তো মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পাবে !

এ বাড়ির বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়াটা হঠাৎ একদিন থেমে গেল। কারণ বাড়িওয়ালা বলে কেউ রইলোই না। চুনীলাল শীলের ব্যবসা বেশ খারাপ চলছিল, অনেক মামলা মোকদ্দমাতেও জড়িয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একদিন বিক্রি করে দিল এই বাড়িটা। নতুন বাড়িওয়ালা যে কে হলো তা বোঝাই গেল না। কানা ঘুষোয় জানা গেল বটে তা কোনো মাড়োয়ারী কিনেছে, কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায়নি একদিনও। এ পাড়ার সব বাড়িই একে একে মাড়োয়ারীদের দখলে চলে যাচ্ছে, কেউ বাড়ি বিক্রি করলে তা কোনো মাড়োয়ারীই যে কিনবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই চারতলা বাড়িটার পুরোটাই ভাড়া, সবাই পুরনো আমলের। এত ভাড়াটে শুদ্ধ বাড়ি কিনে মাড়োয়ারীর কী লাভ হবে ?

এক রবিবার সকালে সব ভাড়াটে মিলে একটা মিটিং করলো। যে বাড়িওয়ালাকে দেখা যায় না, সে অতি বিপজ্জনক। মাড়োয়ারী যখন বাড়ি কিনেছে তখন ভাড়াটে তোলার চেষ্টা করবেই সে। কোন দিক থেকে বিপদ আসবে কেউ জানে না। এ সময় সকলকে একজোট হয়ে থাকতে হবে। ভাড়া বাকি পড়লে বাড়িওয়ালা সুযোগ পাবে, সুতরাং সকলেরই উচিত নিয়মিত রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া পাঠানো।

খুব ভালো ভালো কথা হলো। যদিও সব ভাড়াটেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখির সম্পর্ক নেই। মিটিং-এর পর থেকে আবার ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগলো যথা নিয়মে।

কয়েক মাস বাদে সুদর্শন শুনতে পেল বাড়িওয়ালার এক দালাল নাকি বিভিন্ন ভাড়াটেকে টাকার লোভ দেখিয়ে তুলে দেবার চেষ্টা করছে। এক একজনকে পাঁচ দশ হাজার টাকা দেবে।

কিন্তু সুদর্শনকে তো কেউ কিছু বলে নি ? আবার সুদর্শন বেরিয়ে যায় সকাল সাড়ে আটটায় আর ফেরে সেই রাত নটার পর। তার দেখা পাবে কি করে ?

অসীমাকে সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কিছু শুনেছো ? বাড়িওয়ালা নাকি টাকা দিতে চাইছে ?

অসীমার গর্ভে আবার সন্তান এসেছে। তার মুখ ভার। ছেলে আজ বল খেলতে খেলতে বারান্দায় চলে গিয়েছিল, এমন ভাবে ঝুঁকেছিল যে রাস্তার লোক হৈ হৈ করে উঠেছে। আর একটু হলেই নিচে পড়ে যেত।

অসীমা বললো, তুমি আর কাকাবাবুরা মিলে বারান্দাটা সারিয়ে নিতে পারো না ? আমাদের যখন এখানেই থাকতে হবে...

সুদর্শন অবাক হয়ে বললো, যার বাড়ি তার ঠিক নেই, আমরা পয়সা খরচা করে বারান্দা সারাবো ?

অসীমা বললো, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। টুবুন তো ছোট, ওকে আর দোষ দেবো কি ! তোমার মা-ই সকাল বেলা ভুল করে বারান্দায় চলে যাচ্ছিলেন। কিছু একটা হলে আমার দোষ হতো !

পাশের ঘরে মায়ের কাশির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মা আজকাল চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। সুদর্শন সত্যিই তার মায়ের মৃত্যু চায়। কিন্তু বারান্দা ভেঙে পড়ে মরলে লোকে সত্যিই অসীমার নামে বদনাম দেবে।

অসীমা বললো, আমার দু'গাছা চুড়ি বেচে যদি কোনো রকমে বারান্দাটা মেরামত করতে পারো, তাতেও আমি রাজি আছি।

সুদর্শন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অসীমার চুড়ি ছুঁগাছার কথা সে ক'দিন ধরেই ভাবছে। কালীঘাটের মোড়ে ফুটপাথের ওপরে দোকান আর রাখা যাবে না। রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে। এ তো আর হকার উচ্ছেদ নয় যে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে? ফুটপাথই যদি না থাকে...। অন্য জায়গায় আবার দোকান বসাতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে। জায়গা পাওয়াই দারুণ শক্ত ব্যাপার। তখন অসীমার চুড়ি ছুঁগাছা ছাড়া আর উপায় নেই। দোকানই যদি না থাকে তাহলে বারান্দা দিয়ে কী হবে?

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুদর্শন দেখলো গুরুপদবাবুদের বাড়ির মালপত্র তোলা হচ্ছে একটা লরিতে।

দারুণ অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কাকা, আপনারা চলে যাচ্ছেন?

গুরুপদ বাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ,....আজ না হয় কাল তো যেতেই হতো'''বাড়িওয়ালা এ বাড়ি ভেঙে ফেলে দশতলা বাড়ি তুলবে শুনছি

—আমাদের না তুলে কী করে বাড়ি ভাঙবে?

—ভাঙতে শুরু করলে আমাদের যেতেই হবে। সল্ট লেকে বাড়ি করেছি একটা, কেন আর এখানে কষ্ট করে থাকা। তোমার কাকীমা বলছেন, এ পাড়াটাই আর ভালো লাগছে না। এ পাড়ায় আর বাঙালীরা থাকতে পারবে না!

সুদর্শনের ভুরু কুঁচকে গেল। গুরুপদ বাবু সল্ট লেকের জমিতে ভিত খুঁড়ে অনেক দিন ফেলে রেখেছিলেন। ওঁর বড় ছেলে আলাদা হয়ে গেছে। টাকা পয়সার নাকি খুব টানাটানি যাচ্ছিল ইদানীং। তবে কী করে বাড়ি শেষ করলেন? হঠাৎ টাকা এলো কোথা থেকে?

সুদর্শনের সন্দেহ হলো। উনি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন। নইলে এত সস্তার বাড়ি কেউ ছেড়ে চলে যায়। অন্য ভাড়াটে বসিয়ে দিলেও তো পাত। কিন্তু উনি একেবারে ছেড়ে দিচ্ছেন।

আস্তে আস্তে অন্য ভাড়াটেও উঠে যেতে লাগলো একজন দু'জন করে। বাড়িওয়ালা নিজে আসে না। কিন্তু তার একজন দালাল ইদানীং ঘোরাঘুরি করে। টাকা দিয়েই ভাড়াটে তুলছে নির্ঘাৎ। অনেক জায়গাতেই এ রকম শোনা যায়। কিন্তু সুদর্শনকে কেউ কিছু বলছে না কেন?

সন্ধ্যের পর এবাড়িতে ঢুকতে এখন গা ছমছম করে। অনেক ঘরই অন্ধকার। সিঁড়ির আলো নেই। জলও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। সুদর্শন দেরি করে ফেরে, ফিরে তাকে অসীমার বিমর্ষ মুখ দেখতে হয়। আজকাল কোনো কথাই সে বলে না।

একদিন সকাল বেলা সুদর্শন আবিষ্কার করলো, অসীমা ঐ ভাঙা বারান্দাতেই একটা ফুলের টব রেখেছে। তাতে কী যেন ফুলও ফুটেছে। বারান্দায় পা দেয় না, দরজার কাছে দাঁড়িয়েই অসীমা টবে জল দেয়।

ক'দিন ধরে সুদর্শনের দোকান উঠে গেছে। সে কথা সে অসীমাকে বলতে পারে নি। সে মুগ্ধভাবে নতুন ফোটা ফুলগুলো দেখে। তারপর চা মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। নতুন জায়গা খুঁজে দোকান আবার চালু করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে পরের মাসে। দোকানের ক্যাপিটাল তার নিজস্ব নয়, সবই ধার।

সন্ধ্যেবেলা পাড়ার দুটো মাস্তান ছেলে তাকে ধরলো। দুজনকেই চেনে সুদর্শন। এরা গোলা বাজারে গুণ্ডামি করে। এদের মধ্যে হাবু তার সঙ্গে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল স্কুলে। এখন তাকে দাদা দাদা বলে।

হাবু বললো, খোকনদা, শোনো, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

—কী রে হাবু, কী ব্যাপার?

বেশি সময় নষ্ট করবো না হাবু। সুদর্শনের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, তুমি এবারে পাড়া বদলাও। এ পাড়ায় তোমার মতন কমদামি মানুষদের আর জায়গা হবে না।

—বলিস কি রে, হাবু! বাড়ি ছাড়লে আমি যাবো কোথায়? জানিস তো আমার অবস্থা। নতুন করে ঘর ভাড়া নেবার কি আমার সামর্থ আছে?

—কালীঘাটের দিকে কোনো বস্তিতে ঘর খুঁজে নাও।

—এতকাল এ পাড়ায় আছি। তোদের কোনো ক্ষতি করেছি কখনো? হাবেল মার্ডার হবার পর পুলিশ আমাকে সাক্ষী দিতে বলেছিল, তখন দিয়েছি আমি?

—ওসব জানি না। তুমি পাততাড়ি গুটাও। তুমি এখানে আর থাকতে পারবে না।

সুদর্শন ব্যাকুলভাবে হাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বললো, তোরা আমার সঙ্গে এমন করছিস? আর, এ পাড়ায় বাঙালীদের সব বাড়িগুলো একে একে বেহাত হয়ে যাচ্ছে। বাঙালীর কোনো জায়গা থাকবে না? তুই নিজে বাঙালী হয়ে আমাকে তাড়াতে চাস!

হাবু বললো, ও সব বাঙালী-ফাঙালী আমি বুঝি না। বাঙালীদের পয়সার মুরোদ আছে? আমাদের যে পয়সা দেবে আমরা তার দিকে টানবো। বাঙালী নাম কি ধুয়ে খাবো? তোমাকে ভালো কথা বলে দিচ্ছি—

সুদর্শনের বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা তাকে সেহাৎ

চুনোপুটি জ্ঞান করে টাকা দিয়েও তুলতে চায় নি। হাবুলের দলকে কিছু টাকা দিয়েছে, ওরাই এখন ভয় দেখিয়ে বাকি ভাড়াটেদের তুলে দেবে। কিন্তু সুদর্শন এখন যাবে কোথায় ?

অসীমার সঙ্গে এ সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করা যায় না। অসীমা এখন বারান্দায় তিনটে টব বসিয়েছে। সাহস করে সে আজকাল ঐ বারান্দাতেও গিয়ে দাঁড়ায়। সুদর্শন নিষেধ করলেও শোনে না। কী যেন হয়েছে অসীমার।

বাড়িতে ঢোকার আগে সুদর্শন কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কাঁদে।

হাবুর চোখ দেখেই সুদর্শন বুঝতে পেরেছে, ওরা সহজে ছাড়বে না তাকে। ওরা পয়সার লোভ পেয়েছে। সুদর্শন যখন বাড়িতে থাকবে না তখন অসীমার ওপরে হামলা করতে পারে। এ পাড়াতে কেউ অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কালীঘাটে দোকান খোলার জন্য অন্য একটা জায়গা কোনোক্রমে খুঁজে পেয়েছিল সুদর্শন। সেখানেও পাড়ার মাস্তানরা এসে বাধা দিয়েছে। ও জায়গাটা এমনি এমনি কেউ পাবে না। ওদের উপস্থিতিতে নিলাম হবে, যে বেশি টাকা দিতে পারবে সে পাবে। পাঁচ-ছ হাজারের কমে কথাই নেই।

পাতাল রেলের মজুররা আজ সুদর্শনের দোকান যেখানে ছিল, সেই জায়গাটা ভাঙলো। সুদর্শন নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। পাতাল রেল তাকেও পাতালের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাড়ি ফিরে অসীমার সঙ্গে বেদম ঝগড়া হয়ে গেল সুদর্শনের। সাধারণত তার মাথা ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু আজ অসীমার একটা সামান্য কথাই সে সহ্য করতে পারলো না। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললো, মাগী তুই চুপ করবি !

অসীমা জ্বলন্ত চোখে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে থুতু ফেলে দরজা খুলে চলে গেল বারান্দায়।

সুদর্শনের মনে হলো, ও বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে নিচে। সে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে গিয়েও থমকে গেল। দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়ালে আর দেখতে হবে না।

ভাঙা রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে আছে অসীমা। কাঁদছে নিশ্চয়ই, তবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তিনটে টবের গাছেই ফুল ফুটেছে। সে দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো সুদর্শন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সব মিলিয়ে।

সুদর্শন যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ভেঙে পড়ার শব্দ, কিন্তু ভাঙছে না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অসীমা। সুদর্শনের মনে হলো, সত্যি, একটা বারান্দা না থাকলে বাড়ির মেয়েদের বড় কষ্ট।

পুরুষের চোখ

রাজকন্যা সুকন্যা একলা একলা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মানুষের সঙ্গ আর তাঁর ভাল লাগে না। চেনা-অচেনা কোনো পুরুষ তাঁকে দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সেই দৃষ্টির মধ্যে আছে লোভ। আর মেয়েরা তাঁকে ঈর্ষা করে। সুকন্যার কোনো বন্ধু নেই, তার জন্য দায়ী তাঁর রূপ। এমন রূপ বুঝি মানুষের হয় না।

সুকন্যার বিয়ের ব্যাপারেও দারুণ গোলযোগ। দেশ-বিদেশ থেকে রাজকুমারেরা এসে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, সবাই সুকন্যাকে চায়। সুকন্যা যেন শুধু একটা লোভনীয় ভোগ্যবস্তু। সুকন্যা এর প্রতিশোধ নেন নিষ্ঠুরভাবে। রাজকুমারদের লড়াইতে নামিয়ে তিনি কৌতুক বোধ করেন। কাউকেই বিয়ে করতে তাঁর মন চায় না।

সুকন্যার বাবার চার হাজার স্ত্রী। এমন ভোগী রাজা আর ভূ-ভারতে নেই। ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে সর্বক্ষণ উৎসবের মাতামাতি দেখে দেখে ভোগ বিলাসের প্রতি সুকন্যার ঘেন্না ধরে গেছে।

রাজা শর্যাতি তাঁর সমস্ত স্ত্রী এবং প্রচুর লোক-লস্কর নিয়ে বনে এসেছেন বিহার করতে, সুকন্যাকেও সঙ্গে আসতে হয়েছে। কিন্তু তিনি দূরে দূরে থাকছেন।

বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সুকন্যা এক জায়গায় একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। একটা বড় গাছ তলায় একটা উইপোকার ঢিবি জমে আছে, তার মধ্যে দুটো হীরের টুকরো জ্বলজ্বল করছে। এখানে হীরে এল কী করে ? সুকন্যার মাথার চুলে যে সোনার কাঁটা ছিল সেটা দিয়ে তিনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে

হীরে দুটো তোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে দুটো সহজে উঠতে চায় না, উপরন্তু সেই ঢিবির মধ্যে থেকে খুব ক্ষীণ ভাবে যেন একজন মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সুকন্যা তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি আরও জোরে খোঁচাতে লাগলেন। তখন সেই হীরের মতন উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলেন সুকন্যা। একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন কাউকে কিছু বললেন না।

পরদিন একটা সাংঘাতিক অলৌকিক কাণ্ড হল। রাজা-রানী, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত সকলের মল-মূত্র বন্ধ হয়ে গেল। প্রাত্যহিক এই স্বাভাবিক কৃত্যটি সম্পর্কে এমনিতে কেউ কিছু খেয়ালই করে না, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলেই টের পাওয়া যায় যে এটা শরীরের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়। পর পর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।

তখন প্রবীণ মন্ত্রীরা রাজাকে বললেন, দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ঋষি ছাড়া এরকম শাস্তি দেওয়া আর কারুর সাধ্য নয়। শোনা যায়, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন এই বনে তপস্যা করেন। অনেককাল অবশ্য তাঁকে কেউ দেখেনি। কোনো কারণে তিনি রুষ্ট হননি তো?

সকলকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ কোনো ঋষিকে সেই বনে দেখেছে কিনা বা তাঁর প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করেছে কিনা। সকলেই বললেন, না।

সুকন্যা তখন জানালেন যে এক জায়গায় একটা উইঢিবির মধ্যে জোনাকির মতন কিছু জ্বলতে দেখে তিনি কৌতূহল বশে চুলের কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়েছেন, তাতে রক্ত গড়াতে দেখেছেন। জোনাকির কি রক্ত থাকে।

রাজা দৌড়ে গেলেন সেই গাছ তলায়। লোকজনেরা সন্তর্পণে সেই উইঢিবি ভাঙল। তার মধ্যে বসে আছে এক অতি কুৎসিত চেহারার, অতি বৃদ্ধ ঋষি। ইনিই ভৃগুতনয় চ্যবন, কতকাল যে এখানে এক ঠাঁইতে বসে আছেন তার ঠিক নেই, উইয়ের ঢিবি ওঁর শরীর ঢেকে দিয়েছিল।

রাজা হাত জোড় করে ঋষির কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমার মেয়েটি বড় অস্থিরমতি, লঘু। বললেন, সে একটা দোষ করে ফেলেছে। আপনি ক্ষমা করুন।

সুকন্যার চুলের কাঁটার খোঁচায় চ্যবন ঋষির দু'চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। তিনি ধীর স্বরে বললেন, রাজা, আমার চক্ষু নষ্ট হয়েছে সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়, আমার দিব্য চক্ষু আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষতি এই যে আমার ধ্যান নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়েকে আমি কয়েক পলক মাত্র দেখেছি, ঐ রূপ আমার হৃদয় বল্লসে দিয়েছে। দর্প ও অহঙ্কার বশে তোমার মেয়ে যা করেছে, তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাকে এই বুড়োকে বিয়ে করতে হবে। দেখ, রাজি

থাক তো বল, তাহলে তোমাদের শাপমুক্ত করব।

অরাজি হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাজা নিজেই তখন পেটের ব্যথায় কাতর। রানীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেছে। রাজা সেই দণ্ডেই লোল চর্ম বৃদ্ধ ঋষির হাতে রমণীশ্রেষ্ঠা সুকন্যাকে তুলে দিলেন।

সুকন্যা প্রথম ক'দিন খুব কান্নাকাটি করলেন বটে, কিন্তু এক পক্ষকাল কেটে যাবার পর তাঁর অন্যরকম অনুভূতি হল। বনের মধ্যে পাতার কুটিরে ফল-মূল খেয়ে থাকা, জলাশয় থেকে জল তুলে আনা, অন্ধ স্বামীর সেবা করা, এ যেন অনেকটা রূপকথার গল্পের মতন। রাজার দুলালী এখন সামান্য বনবালা। এক সময় শত শত দাস-দাসী তাঁর সেবা করত, আজ স্বামীর পা টিপে দেবার সময় অন্যমনস্ক হলে তিনি বকুনি খান। এই ভূমিকাটা তাঁর বেশ পছন্দই হল।

সুকন্যার ধারণা ছিল জঙ্গলের মুনি ঋষিরা বুঝি সব সময় শক্ত শক্ত সংস্কৃতে কথা বলেন, তা তো নয়, ঋষি চ্যবন প্রাকৃত ভাষা বেশ ভালই জানেন আর অনেক রসের গল্প শোনান। শাস্ত্র বচন ঝেড়ে সুকন্যাকে কাবু করার বদলে আদি রসাত্মক কাহিনী শুনিয়ে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। তবে চ্যবন ঋষি সত্যই বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কাম কলায় অভিজ্ঞ হলেও শরীর এখন আর উত্তপ্ত হয় না। শরীর এমনই জিনিস যে শত ধ্যানের পুণ্য ফলেও আর যৌবন ফিরে পাওয়া যায় না।

ভালোই দিন কাটছিল। সুকন্যা আস্তে আস্তে প্রকৃতি-কন্যা হয়ে উঠলেন। তিনি গাছপালার সঙ্গে কথা বলেন, পাখির ডাকের সঙ্গে গলা মেলান। রাজ-বাড়িতে থাকার সময় লোকজনের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা আর স্তুতিবাক্য শুনতে শুনতে তাঁর কান পচে গিয়েছিল, এখানে, এই নির্মল বাতাসে, নির্জনতায়, তিনি যেন অমৃতের স্বাদ পেতে লাগলেন।

এই জঙ্গলের মধ্যে তাঁর পোশাক পরারও প্রয়োজন হয় না সব সময়। তাঁর স্বামী অন্ধ, অন্য কেউও দেখবার নেই। স্নানের সময় তিনি নগ্ন হয়ে জলকেলি করেন।

একদিন স্নান সেরে সুকন্যা সেই অবস্থায় উঠে আসছেন। এমন সময় দেখলেন তীরে দুটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তারা যথেষ্ট রূপবান ও ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরনে, তবে দু'জনকে দেখতে হুবহু এক রকম, খুব সম্ভব যমজ।

লোক দুটি ঠিক দুর্বৃত্ত নয়। সুকন্যাকে দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লো না। চক্ষু দিয়ে তাঁর রূপের বন্দনা করতে লাগলো। সুকন্যা ভাবলেন, এরা নিশ্চয়ই তাঁর আগেকার ব্যর্থ প্রেমিক দুই রাজপুত্র, এখনো হাল ছাড়ে নি, খুঁজতে খুঁজতে এই পর্যন্ত চলে এসেছে। বিরক্তিতে তাঁর অধর একটু কুঁচকে গেল।

যুবকদের মধ্যে একজন বলল, হে ভাবিনী, তুমি কার ঘরণী না কার বালা?

এই গহন অরণ্যে একা রয়েছ কেন ?

সুকন্যা বললেন, বনের মধ্যে কারুর একা থাকার স্বাধীনতা নেই বুঝি ?

অন্য যুবকটি বলল, তোমার এই দেবদুর্লভ রূপ, এ তো জগৎ জয় করবার জন্য। তোমার তো একা থাকার কথা নয় ! কেউ কি তোমাকে এখানে নির্বাসনে পাঠিয়েছে ?

সুকন্যা বললেন, না, আমি স্বেচ্ছায় এখানে আছি। আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন, আপনাদের সঙ্গে আমি এই অবস্থায় আর বাক্যালাপ করতে চাই না।

একজন যুবক বলল, আপনি আপনার রূপের এই অপমান করছেন কেন ? শ্রেষ্ঠ বস্ত্র, মণি-মাণিক্যের অলঙ্কারগুলো তৈরি হয়েছে কেন, যদি তা আপনার অঙ্গে না ওঠে ? চলুন, আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা আপনাকে এই বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ সুন্দর করে সাজাবো !

সুকন্যা বললেন, ভালো ভালো পোশাক, হীরে মুক্তোর গয়না এক সময় আমার অনেক ছিল, অনেক দেখেছি। সবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আপনারা আমার পথ ছাড়ুন। আমি মহারাজ শর্যাতির মেয়ে, যোগী শ্রেষ্ঠ চ্যবন আমার স্বামী।

দুই যুবক প্রায় হাহাকার করে উঠলো, চ্যবন আপনার স্বামী ? হায় হায়, সে যে সাত বুড়োর এক বুড়ো ! এ খুব অন্যায় ! ঘোর অন্যায়। আপনার মতন সুন্দরী চ্যবনের হাতে পড়ে জীবনটা নষ্ট করবে ? এ হয় না। আপনি ওকে ত্যাগ করে আমাদের দু'জনের যে-কোনো একজনকে বরণ করুন। আপনি চ্যবন ঋষির অভিশাপের ভয় পাবেন না। ও সব আমাদের গায়ে লাগে না।

সুকন্যা বললেন, আপনাদের মতন শত শত রাজকুমারকে আমি এর আগে প্রত্যাখান করেছি। আপনারা তাদের তুলনায় এমন কিছু আহামরি নন। আমার এই বুড়ো বর আর পাতার ঘরই পছন্দ।

একজন যুবক বলল, তা হলে আর একটা প্রস্তাব শুনুন। আমরা নানা রকম চিকিৎসা জানি। আমরা আপনার স্বামীর যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারি, তাকে রূপবান করে দিতে পারি। তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসবে। তার বদলে আপনি...

অন্য যুবকটি বলল, বদলে দরকার নেই। চিকিৎসার বিনিময়ে আমরা কিছু চাই না। তবে আপনার স্বামী রূপ-যৌবন ফিরে পেলে আপনি আমাদের তিন জনের মধ্যে থেকে যে-কোনো একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নেবেন। রাজি ? দেখুন, এটা অন্যায় কিছু বলি নি।

সুকন্যা বললেন, আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যৌবন ফিরে পেতে রাজি কি না সেটা আগে জানা দরকার।

আশ্রমে ফিরে এসে সুকন্যা চ্যবন ঋষিকে সব কথা খুলে বললেন। চ্যবন ঋষি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যৌবন ও স্বাস্থ্য ফিরে পেতে কার না ইচ্ছে হয় ! আমারও লোভ হচ্ছে। কিন্তু তার বদলে তোমাকে হারাতে হবে। কী করি বলো তো ?

সুকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আমাকে হারাতে হবে কেন ? আমি ওদের পছন্দ করব না !

চ্যবন বললেন, ঐ ছোকরা দুটি দেবতাদের চিকিৎসক। ওদের নাম অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ওরা নানা রকম জাদু জানে। ওদের মায়ায় তুমি আর আমাকে চিনতে পারবে না ! তবু চল, পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সুকন্যা বুঝলেন যে যৌবন ফিরে পাওয়ার প্রস্তাবটা তাঁর স্বামীর খুব মনে ধরেছে।

বাইরে এসে অশ্বিনীকুমারদের সুকন্যা তাঁর সম্মতি জানালেন। ওরা দু'জন চ্যবন ঋষির হাত ধরে ধরে সেই জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তিনজনে একসঙ্গে ডুব দিয়ে ফের উঠে আসতেই সুকন্যা দেখলেন যমজের বদলে ত্রয়ী। তিনজনের এক রকম রূপ, এক রকম পোষাক, এক রকম মুখশ্রী।

সুকন্যা আবার তাঁর শাড়িটি খুলে নগ্ন হলেন। কয়েকটি মুহূর্ত তিনি সেই তিন যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর এগিয়ে গিয়ে একজনের বুকে হাত রেখে বললেন, ইনিই আমার স্বামী।

সঙ্গে সঙ্গে চ্যবন ঋষি বললেন, সুকন্যা, তুমি ধন্য !

অশ্বিনীকুমার দুটি তো অবাক। তাঁরা দু'জনে চ্যবন ঋষির দিকে ফিরে তাকাল।

একজন বলল, ঋষি, আশা করি, আপনি আমাদের সঙ্গে ছলনা করেননি !

অন্যজন বলল, আপনি আপনার স্ত্রীকে আগে থেকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন ? কিংবা কিছু ইঙ্গিত করেছেন ?

চ্যবন ঋষি বললেন, আরে ছি ছি, সে রকম কী আমি করতে পারি ? সে তো জুয়াচুরি ! না, না, আমি সে রকম কিছুই করিনি। সুকন্যার কাণ্ড দেখে আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেছি !

ওরা তখন সুকন্যাকে বলল, আমরা হার স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি বলুন তো, কী করে আপনি আমাদের মধ্যে থেকে ঠিক ঠিক আপনার স্বামীকে চিনে নিলেন ?

সুকন্যা বললেন, এ তো খুব সোজা! আপনারা তো অনেক মেয়ে দেখেছেন, অনেক ভোগ করেছেন! আমি যেই শাড়িটা খুলে ফেললুম, অমনি আপনাদের দু'জনেরই চোখে ফুটে উঠল চকচকে লোভ। আর উনি তো বহুদিন কোনো যুবতী মেয়ে দেখেননি, তাই ওঁর চোখে ফুটে উঠল দারুণ বিস্ময়! আমি লোভী চোখ অনেক দেখেছি, ওরকম বিস্ময় ভরা চোখ আগে দেখিনি। তাই ঐ চোখ দুটিই আমার পছন্দ হল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশ্বিনীকুমার দুটি বলল, সুকন্যা, আপনি সত্যিই ধন্য! নিন, শাড়িটা পরে নিন। এখন থেকে আপনাকে আমরা অন্য চোখে দেখব, আপনাকে বৌদি বলে ডাকব।

চ্যবন ঋষি বললেন, সুকন্যা, ওদের কিছু ফল-মূল খেতে দাও!

অলৌকিক

একদিন দিব্য স্নান শেষ করার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছিল দরজা খুলে। নিজের শোবার ঘরে না গিয়ে সে টানা বারান্দা পেরিয়ে নামতে শুরু করে দিল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর সদর দরজা পার হয়ে চলে এসেছিল রাস্তায়। তখনও তার কিছু খেয়াল হয়নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তা, একটু পরে বাঁ দিকে বেঁকে আর একটা রাস্তা, তারপর এক মিনিট গেলে ট্রাম লাইন। দিব্য ছোট রাস্তাটা পেরিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে, তখন তার চোখ পড়ল চন্দনের দিকে। চন্দনকে যেন ভূতে থাপ্পড় মেরেছে, তার মুখখানা এমনই বিহ্বল। চন্দন চোখের পাতা ফেলতে পারছে না।

চন্দনের চোখ দিয়েই যেন দিব্য নিজেকে দেখতে পেল। সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গায়ে সাবানের ফেনা।

জামা কাপড় না থাকলে বোধহয় মানুষ নিজের শরীরটাকে খুব ছোট্ট মনে করে। নইলে দিব্য কেন ভাবল আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাত চাপা দিলেই সে তার নগ্নতা লুকোতে পারবে?

চন্দন কিছু বলবার আগেই দিব্য পেছন ফিরে ছুটল! বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে আছাড় খেয়ে তার থুতনি কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। এই সব কিছুই পাগলের মতন।

দিব্যকে যদি কেউ কেউ পাগল ভাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঐ অবস্থায় শুধু তো চন্দন তাকে একা দেখেনি, অনেকেই দেখেছে। এ বাড়ি ও বাড়ির বারান্দায়, মোড়ের দোকানপাট থেকে। মানুষ তার গৌরবের সময় প্রায়ই নিঃসঙ্গ থাকে। কিন্তু অপমানের মুহূর্তে সাক্ষীর অভাব হয় না।

চন্দন অবশ্য পরে এ বিষয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। পাড়ার কেউই কিছু বলেনি। দিব্যর বয়েস আটত্রিশ, সে প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজে, মোজা ও জুতো পরে অফিস যায়। পাড়ার সবাই তাকে একই সঙ্গে উদার ও বুদ্ধিমান বলে জানে, তাই কিঞ্চিৎ সমীহ করে।

দিব্য নিজেই পরে অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি যে সেদিন সে কেন ঐ অবস্থায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। হঠাৎ কি তার মনে পড়ে গিয়েছিল কোন জরুরি কাজের কথা? কী সেই জরুরি কাজ?

বাথরুমে মানুষ নগ্ন থাকে, অন্যমনস্ক থাকে, নিজের চরিত্রটা বদলে ফেলে, সময়ের খেয়াল থাকে না এই সবই ঠিক, কিন্তু কোমরের নিচে কিছু না জড়িয়ে কেউ তো বাইরে বেরোয় না। ভুল-মনা অধ্যাপকদের সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়, কিন্তু দিব্য তো সেরকমও নয়। দিব্য বেশ মেপে-টেপে কথা বলে, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে।

অনেকদিন আগে অবশ্য আর একবার এরকম হয়েছিল, সেটা কাশীতে। দিব্যর বয়েস তখন এখনকার অর্ধেক। কী কারণে যেন সেবার কাশীতে ষোড়-দুঁশাগ থাকা হয়েছিল, মাসি-পিসিদের সঙ্গে সাময়িক যৌথ পরিবারের অভিলাষ। টুনু ও পিনাকীর সঙ্গে দিব্য গঙ্গায় সাঁতার কাটতে নেমেছিল।

দিব্য সাঁতার জানে, পিনাকীই ছিল খানিকটা দুর্বল, তাকে সামলাচ্ছিল অন্য দুজন। হঠাৎ এক সময় দিব্য ওপরে উঠে এল। সুইমিং ট্রাঙ্ক নয়, জাঙিয়া পরে নেমেছিল, সেটা যে শুধু পরা নেই তা নয়, সে সম্পর্কে তার কোন হুঁশই নেই। জাঙিয়া আপনা আপনি খুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক নয়, দিব্য কি ইচ্ছে করে খুলে ফেলেছিল? তার মনে নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে সব সময় হাজার লোকের ভিড়। পাগল, ভিখিরী ও সন্ন্যাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট। দিব্যকে ঐ অবস্থায় উঠে আসতে দেখে কেউ হৈ হৈ করে ওঠেনি, কেউ কোন মন্তব্য করেনি।

ওদের স্নেহ মাসি আর রথীন মেসো বসে ছিলেন একটু দূরে জামা কাপড় সামলাবার জন্য। আর ছিল ছ'তিনটে কাচ্চা-বাচ্চা পিসতুতো-মাসতুতো ভাই-বোন। রথীন মেসো হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, কাচ্চা-বাচ্চারা হাততালি দিয়েছিল আর স্নেহ মাসিও হাসতে হাসতে একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই পাগল, তুই ল্যাংটা উঠে এলি, অ্যাঁ?

রথীন মেসোর হাসির চেয়েও স্নেহ মাসির অত হাল্কা সুরে কথা বলাটাই দিব্যর স্মৃতিতে গেঁথে আছে। তখন দিব্যর উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস, সে একটি পূর্ণাঙ্গ যুবক, তাকে ঐ অবস্থায় দেখেও স্নেহ মাসি দিব্যকে একটা শিশুর মতন গ্রহণ

করেছিলেন কী করে? পরে অনেকবার স্নেহ-মাসি হাসতে হাসতে পারিবারিক মজলিসে ঐ গল্প বলেছেন, জান, সেজদি, দিব্যটা এমন পাগল, ঐ রকম ভাবে সে উঠে এসেছে, তা খেয়ালই নেই। আমি তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিলুম, তা দিয়ে প্রথমে মাথা মুছতে লাগল!

দিব্যর মা অবশ্য বরাবরই এ গল্পটা অবিশ্বাস করেছেন। একমাত্র মায়েরাই বোধহয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের নগ্নতা মেনে নিতে পারেন না।

কেন কাশীর গঙ্গা থেকে দিব্য ঐরকম ভাবে হঠাৎ উঠে এসেছিল তা সে আজও মনে করতে পারে না। সে তার চৈতন্যের গভীরতম দেশ পর্যন্ত খুঁজে দেখতে রাজি আছে এর উত্তর পাবার জন্য। কিন্তু খানিকটা ডুব দিয়েই সে অন্য চিন্তায় হারিয়ে যায়।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা অবশ্য নগ্নতার কিছু নয়। মাত্র দেড় বছর আগেকার কথা। সেদিন দিব্য খানিকটা মদ পান করেছিল, আড়াই তিন পেগের মতন। দিব্য অত্যন্ত শেয়ানা মাতাল। যাদের মধ্যে ভদ্রতাবোধ অতি প্রবল তারা সহজে মাতাল হয় না। অফিসের পার্টিতে কিংবা বন্ধুমহলে দিব্যর এই রকম একটা কিংবদন্তির খ্যাতি আছে যে ছ'সাত পেগ হুইস্কি খেলেও দিব্যর পা টলে না, জিভ জড়ায় না। এমন কি একবার বোম্বাই গিয়ে হোটেলে পার্টির হৈ-চৈতে সাত পেগ মদ খাবার পর জেনারেল ম্যানেজারের অনুরোধে দিব্য একটা জরুরি চিঠি ড্রাফ্‌ট করেছিল, তার হাতের লেখা একটুও বদলায়নি, ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্স, পার্ট পার্সন সিঙ্গুলার ব্যাপারে সে একবারও এস দিতে ভুল করেনি। অফিসে দিব্যর এই চিঠি লেখার গল্প কিংবদন্তি হয়ে আছে।

সেই দিব্য এয়ারপোর্ট হোটেলের অফিসের পার্টিতে থেকে মাত্র আড়াই তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে হঠাৎ কারুকে কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। সোজা যোধপুর পার্ক। কম দূর তো নয়। এর মধ্যে দিব্য একটুও ঘুমিয়ে পড়েনি, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে একবারও ভুল করেনি। যোধপুর পার্কের রাস্তাগুলো খুব গোলমেলে, বিশেষতঃ গভীর রাত্রে। দিব্য তবু ঠিক বাড়ির সামনেই এসে উপস্থিত হয়েছিল।

দোতলা বাড়ি, সামনে খুবই সামান্য, ক্ষমাপ্রার্থীর মতন এক চিলতে বাগান। হাত গেট অনায়াসেই খোলা যায়, এইসব বাড়িতে হিংস্র কুকুর থাকা খুব স্বাভাবিক। দিব্য সেসব গ্রাহ্যই করেনি। একতলার দরজা কেন খোলা ছিল কে জানে, দিব্য সটান উঠে গিয়েছিল দোতলায়। তারপর বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কলিং বেলের বোতামে ডান হাতের তর্জনী চেপে ধরেছিল।

এ বাড়িতে দিব্য আগে কখনো আসেনি, দূর থেকে দু-একবার দেখেছে মাত্র।

দিব্য কি জানতো ডঃ খাণ্ডেলকর সে রাতে বাড়িতে থাকবেন না? দিব্য পরে বহুবার এ তথ্য অস্বীকার করেছে। ডঃ খাণ্ডেলকর কখন কোথায় যান তা দিব্যর জানবার কথা নয়। দিব্য আর ডঃ খাণ্ডেলকরের গ্রহ আলাদা।

একটানা কলিং বেল বাজার পর দরজা খুললেন মিসেস খাণ্ডেলকর। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢোলা একটা সাদা রঙের রাত-পোশাক পরা। মাথার সব চুল খোলা, ক্রিম মাখা মুখখানা চকচকে। এমন পোশাকে, এমন প্রসাধনে দিব্য ঐ মিসেস খাণ্ডেলকর নাম্নী রমণীকে আগে কখনো দেখেনি। আসলে সে ওঁকে এর আগে দেখেছেই মাত্র তিনবার, নিছক সৌজন্য—আলাপ, বাংলায় কথাবার্তা হলেও আপনি ছেড়ে তুমিতে নামেনি। দরজা খোলার পর সেই শ্বেতবসনা রমণীকে দেখে দিব্য বলেছিল, কেমন আছ, মহাশ্বেতা?

মিসেস খাণ্ডেলকর বাঙালী হলেও তাঁর নাম মহাশ্বেতা নয়। কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল অনসূয়া রায়।

প্রগাঢ় বিস্ময়ে তিনি কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না।

দিব্য হঠাৎ করে দশটা জানলা খোলার মতন অনেকখানি হেসে বলেছিল, তুমি ভাল আছ তো, সেই খবরটা নিতে এলাম?

শ্রীমতী খাণ্ডেলকর বললেন, হোয়াট ড্যু য়ু ওয়ান্ট? আর ইউ... আর আই... ইন... ইজ দেয়ার ট্রাবল? আর ইউ লস্ট?

দিব্য বলল, নো, নো, নো, নাথিং ড্যু য়ু মি, আই ওয়াজ জাস্ট পাসিং থ্রু। ভাবলুম, তোমার খবরটা একবার নিয়ে যাই।

শ্রীমতী খাণ্ডেলকর এবার বাংলায় বললেন, কিন্তু এত রাত্তিরে আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, আপনার বাড়ি তো মানিকতলায়!

মানিকতলা যেন একটা দুর্বোধ্য শব্দ, এই ভাবে দিব্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শ্রীমতী খাণ্ডেলকরের দিকে। কোন উত্তর দিল না।

আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

মহাশ্বেতা, তুমি ভাল আছ?

আপনি মহাশ্বেতা কাকে বলছেন? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। ভুল জায়গায় এসেছেন।

কিন্তু ভুল হয়নি। তুমি নিজেকে চেনো না? তুমি 'কাদম্বরী'র একটা চরিত্র, মনে নেই? তুমি কেমন আছ আজ!

আপনি বাড়ি যান!

না, আমি আজ এখানেই থাকব, তোমার সঙ্গে সারারাত গল্প করব।

প্লীজ, একথা বলবেন না। আপনার সঙ্গে যদি গাড়ি না থাকে, আমার চিন্তা

হচ্ছে আপনি কী করে ফিরবেন, কিন্তু... এখানে থাকা সম্ভব নয়, আপনি একটু বুঝবার চেষ্টা করুন....

শ্রীমতী খাণ্ডেলকর যদি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতেন তাহলে দিব্য নিশ্চয়ই সেই দরজায় আবার দুমদুম করে ধাক্কা দিত। উনি যদি রূঢ় ব্যবহার করতেন, দিব্য চেষ্টা করতো জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়তে।

কিন্তু উনি দরজা খোলা রেখে মুখে এমন একটা বেদনার্ত দাবির ভাব ফোটালেন যে দিব্য তখুনি ঘুরে সরে গেল। কোনরকম বিদায় না জানিয়েই সে ছুট দিয়েছিল সিঁড়ের দিকে।

ট্যাক্সিটা দিব্যর জন্য অপেক্ষা করে ছিল না, সে থাকতেও বলেনি। দিব্য সে ব্যাপারে চিন্তাই করল না, সে আঁকাবাঁকা পায়ে হাঁটতে লাগল।

একটা কথাই শুধু ঘুরছিল তার মাথায়। খাণ্ডেলকরের বাড়িতে অন্তত দু-তিনজন দাস-দাসী থাকবেই। এত রাতে বেল দেবার পর অনসূয়া, না, না, মহাশ্বেতা নিজেই কেন দরজা খুলে দিল? সে কি কারুর জন্য প্রতীক্ষা করছিল? উঁহু, এরকম হতেই পারে না। তবে?

রাত একেবারে নিঝঝুম। এখন লোডশেডিং আছে কি নেই তা বোঝবারও উপায় নেই। দিব্য কোনদিকে হাঁটছে সে জানে না।

খানিক পরে তিন-চারটে ভুতুড়ে চরিত্র তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের দাবি অনুযায়ী সে খুলে দিল হাতঘড়ি, পকেট থেকে পার্স। দিব্যর ঠোঁটে মৃদুমন্দ হাসি, সে যেন এসব ব্যাপারে বেশ মজা পাচ্ছে। ছায়ামূর্তিরা দিব্যর পার্সটা খুলে অখুশী ভাবে গজরাতে শুরু করতেই দিব্য বলেছিল, ওতে কিছু হল না? আমার হাওয়াই শার্টটা নেবে? প্যান্ট নেবে? খুলে দিচ্ছি।

একজন নিশাচর এগিয়ে এসে দিব্যর গালে জোরে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল, হারামির বাচ্চা, মাল খেয়ে আমাদের সঙ্গে মজাক করতে এসেছিস? যা, বাড়ি যা!

ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও দিব্য একা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

এসব কোন কিছুই দিব্যর চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। তার ঘনিষ্ঠ মানুষজনেরা বলবে, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।

দুই

নামের পরিচয়ে মহারাষ্ট্রের মানুষ হলেও দু-পুরুষ ধরে খাণ্ডেলকরেরা কলকাতার প্রবাসী। অজয় খাণ্ডেলকরের দুই দাদাই উচ্চ পদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারী, অজয় নিজে

একজন অর্থনীতির পণ্ডিত। ওঁর বোন একটি বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের স্ত্রী।

অজয় খাণ্ডেলকর দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিলেন, ইংরেজি ও বাংলায় সেবারে পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর।

তারপর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো অবহেলায় মেডেল তুলতে তুলতে পেরিয়ে গিয়ে তিনি চলে গেলেন আমেরিকা। সেখান থেকে তিন বছর বাদে দেশে বেড়াতে এসে তিনি পুনে-পুনে ঘুরে ট্রেনে এলেন হাওড়ায়। তারপর কলকাতা শহরে না ঢুকে পরবর্তী ট্রেনে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

অনসূয়ার সঙ্গে এর আগে কলকাতায় তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল, সৌজন্য-মূলক আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। অজয় খাণ্ডেলকরের আশঙ্কা ছিল অনসূয়া তাঁকে চিনতে পারবে কি না।

অজয় খাণ্ডেলকরের চেহারায় বৈশিষ্ট্য আছে, একবার দেখলে ভুলে যাবার কথা নয়। প্রায় সাহেবদের মতন ফর্সা রং, মেদহীন লম্বা শরীর, লম্বাটে মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, অত্যন্ত গাঢ় ভুরু। সম্ভবত ঐ ভুরুর জন্যই তাঁর চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল দেখায়। তাঁর বাংলা উচ্চারণে সামান্যতম আড়ষ্টতা নেই।

পূর্বপল্লীর গেস্টহাউসের প্রায় উল্টোদিকেই অনসূয়াদের বাড়ি। হঠাৎ দেখা হওয়ায় অনসূয়া বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল।

আপনি? আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন কেন? কবে ফিরলেন?

ফিরিনি এখনো।

শান্তিনিকেতনে... আপনার কোন লেকচার আছে বুঝি?

একটুও দ্বিধা না করে সহাস্য মুখে অজয় খাণ্ডেলকর বলেছিলেন, না, আমি শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এসেছি।

এরকম কথা অনেকেই বলে। অনসূয়া এটাকে হাল্কা রসিকতা হিসেবেই নিয়েছিল। তাদের বাড়িতে ডেকে এনে অজয় খাণ্ডেলকরকে সে চা খাওয়াল, পরিচয় করিয়ে দিল বাবা-মায়ের সঙ্গে।

অজয় খাণ্ডেলকর স্কুলে পড়বার সময় একবার শান্তিনিকেতন এসেছিলেন বটে কিন্তু ভাল করে তাঁর দেখা হয়নি সেবার। অনসূয়াই হল তাঁর গাইড। এক সাইকেলরিক্সায় ঘুরতে লাগল দুজনে।

অনসূয়ার ডাক-নাম হাসি, শান্তিনিকেতনে ডাক-নামটাই বেশি চলে। রবীন্দ্র-নাথের আমলে এখানে যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ছিল তা এখনো মুছে যায়নি। রবীন্দ্রভবনের সামনে একজন বৃদ্ধ সুইডিস অনসূয়াকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, হাসি, শোন, তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে।

সাইকেলরিক্সা থেকে নেমে অনসূয়া গেল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে, অজয়

খাণ্ডেলকর চুপ করে বসে রইলেন। মনে হল যেন তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, এই সময়টুকু পেয়েই তিনি একটা জটিল অঙ্কের সমাধান খুঁজছেন।

মিনিট পাঁচেক পর অনসূয়া ফিরে আসতেই তিনি হাল্কা গলায় বললেন, এখানে সবাই আপনাকে হাসি বলে ডাকছে, আমিও সেই নামে ডাকতে পারি।

স্বচ্ছন্দে! আমার আসল নামটা আমার নিজেরই তেমন পছন্দ নয়।

কে রেখেছিল ঐ নাম?

আমার জ্যাঠামশাই, তিনি এখানে সংস্কৃত পড়াতেন। জ্যাঠতুতো দিদির নাম শকুন্তলা।

এখন বাঙালী মেয়েদের তিন অক্ষরে নামটাই ফ্যাশান তাই না?

না, দু'অক্ষরের।

তারপর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, শ্রীনিকেতন ঘুরে আসবার পথে হঠাৎ অজয় খাণ্ডেলকর এক জায়গায় সাইকেলরিক্সা থামাতে বললেন।

একটা জলাশয়ের পাশে বড় আমগাছতলায় দাঁড়ালেন দুজনে। একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অজয় খাণ্ডেলকর বললেন, আমি চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে আপনাকে একটা কথা বলার জন্যই এখানে এসেছি। ওখানে বসে আমি আপনার কথা অনেক চিন্তা করেছি। কথাটা ঠিক কীভাবে বলতে হয় আমি জানি না, যদি কিছু ভুল হয় আপনি অপমানিত বোধ করবেন না। হাসি, আপনাকে আমি আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

পুরুষদের প্রণয় নিবেদন শোনায় পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল অনসূয়ার, তবু তার কানের ডগায় উষ্ণতা এসেছিল, মুখ রক্তিম হয়েছিল।

যাঃ, এসব কী কথা বলছেন।

না, না, না, আপনাকে এক্ষুণি কিছু উত্তর দিতে হবে না। আপনি ভাল করে চিন্তা করে দেখুন।

আপনার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েকদিনের আলাপ।

তাতে কিছু যায় আসে না! এলগিন রোডে ডঃ মৈত্রর বাড়িতে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল মনে আছে? আপনি গান গেয়েছিলেন দুটো, সে গানের লাইনও আমি বলে দিতে পারি। শুনুন, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, আমেরিকায় গিয়ে আমি আপনার কথা অনেক ভেবেছি, তারপর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আপনি সময় নিন। আমি দু'সপ্তাহ কলকাতায় থাকব, তারপর আর এক সপ্তাহ পুনেতে। তারমধ্যে আপনি জানাবেন। যদি রাজি না হন তাও জানাবেন। কিংবা যদি এক বছর, দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাতে আমি রাজি।

আপনি কেন এইসব কথা বলছেন ? আমি একটা অতি সাধারণ মেয়ে।

আমার চোখে আপনি অপ্রতিম !

এরপর ফেরার পথে দুজনে আর একটাও কথা হল না।

এক রিক্সায় দুজনে বসায় অঙ্গস্পর্শ হয়েছিল বটে কিন্তু অজয় খাণ্ডেলকর একবারও হাসির হাত ধরার চেষ্টা করেননি। তাঁর সম্ভ্রমবোধ ও শিষ্টাচার নিখুঁত।

পরদিন হাসিকে কলকাতা ও পুনের দুটি ঠিকানা দিয়ে অজয় খাণ্ডেলকর ফিরে গেলেন।

তারপর কয়েকটি দিন হাসির মানসিক জগতে একটা প্রবল আলোড়ন চলল। একটা ঝড়ের মধ্যে সে যেন দিশেহারা, অথচ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবীদের কাছেও সে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইতে পারে না।

হাসি তখন সঙ্গীত ভবনের নাম করা ছাত্রী। রেডিওতে একবার অডিশান দিয়েই পাশ করেছে। কলকাতার এক বড় অনুষ্ঠানে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শেষ মুহূর্তে প্রধানা গায়িকা এসে পৌঁছতে না পারায় হাসিই শ্যামার চরিত্রের সব ক'টি গান গেয়ে খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল কাগজে কাগজে। অনেকের আশা হয়েছিল শান্তি-নিকেতন থেকে অনেকদিন পর আর একজন প্রতিভাবান রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা উঠে আসছে।

শুধু গান গাইতে জানলে, ছবি আঁকা শিখলে বা লেখার ক্ষমতা থাকলেই হয় না, শিল্পী হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। হাসির তা ছিল। অলকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মতন মেয়ে সে নয়। নিশ্চিন্ত সুখী জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না, সে চেয়েছিল নিজের যোগ্যতায় খ্যাতি অর্জন করতে।

কিন্তু অজয় খাণ্ডেলকর সব গোলমাল করে দিল।

হাসি মনে মনে হাজার বার বলতে লাগল, না না না, আমি এখন বিয়ে করব না, কিছুতেই বিয়ে করব না।

কিন্তু হাসিকে এই কথা বারবার বলতে হচ্ছেই বা কেন ? অজয় খাণ্ডেলকর তো জোর করেননি, এমনকি হাসির বাবা-মাকেও কিছু জানাননি। মাঠের মধ্যে আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে অতি সংক্ষেপে একটি প্রস্তাব দিয়ে গেছেন মাত্র। তারপর দূরে সরে গেছেন। এখন হাসি তো তাঁকে কোনো উত্তর না দিলেই পারে। এসব ক্ষেত্রে নীরবতাই প্রত্যাখ্যান।

অজয় খাণ্ডেলকরের কলকাতা বাসের দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। হাসি চিঠি লেখেনি বটে, কিন্তু প্রতিটি দিন সে গুনেছে। এবারে অজয় যাচ্ছেন পুনেতে। সেখানে আর মাত্র সাতদিন।

শুধু সুপুরুষ আর গুণবানই নয়, অজয়ের চরিত্র ও ব্যবহারে এমন একটা কিছু ছিল যা হাসিকে চুম্বকের মতন টেনেছে। এরই নাম কি প্রেম ? কেন সর্বক্ষণ হাসি ঐ মানুষটির কথাই ভাবছে ? চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে একজন মানুষ এখানে এসেছিল শুধু হাসির সঙ্গে দেখা করার জন্য !

পুনে থেকে একটা টেলিগ্রাম এল হাসির নামে। হাসি তখন বাড়ি ছিল না, তার বাবা সেটি সই করে নিয়েছিলেন, কিন্তু খোলেননি।

হাসি বাড়ি ফেরার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পুনেতে তোর কোন্ বন্ধু আছে রে ?

হাসির সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল। হাসি তার মুখের ভাব লুকোতে পারে না। তার কান্না পেয়ে যাচ্ছে কেন ? বাবার সামনেই টেলিগ্রামটা সে খুলল।

অজয় জানিয়েছে, আমার ফ্লাইট পরশুদিন রাত্রে ! আমি কি কিছুই না জেনে ফিরে যাব ?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে ?

হাসি কিছুই উত্তর না দিয়ে ছুটে গেল বাড়ি থেকে। এবারে একবার তাকে তপনের কাছে যেতেই হবে। বাবা-মাও বন্ধুর মতন, কিন্তু এক্ষুণি সে বাবা-মাকে কিছু খুলে বলতে পারবে না।

সব পুরুষ মানুষই প্রেমিক হবার যোগ্য হয় না। তপন সেইরকম একজন। সে হাসির যত না বন্ধু, তার চেয়ে বেশি ভক্ত। হাসি যে মাটি দিয়ে হেঁটে যায়, কেউ যদি বলে তপন ঐ মাটি জিভ দিয়ে চাটো তো, তপন তা পারবে। কিন্তু তপন কোনদিন বলতে পারবে না, হাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার হও।

লাইব্রেরি থেকে তপনকে হাসি টেনে আনলো। দুজনে চলে গেল রেল লাইনের ধারে। তারপর তপনকে সব খুলে বলল।

তপনের একমাত্র চিন্তা হাসি যেন কিছুতেই কষ্ট না পায়। হাসির মুখ ম্লান হলে তপনেরও মুখ ম্লান হয়ে যায়।

কী হয়েছে হাসি ?

হাসি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সে একটা কথাও বলতে পারছে না।

তপন চুপ করে চেয়ে রইল হাসির মুখের দিকে। তার বুকটা মুচড়ে উঠেছে। কিসের যেন একটা সম্ভাবনা হঠাৎ কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাকে।

একটু পরে, নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে হাসি বলল, তপন, আমি জানতুম না যে আমার মনটা এত দুর্বল ! আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না। আমাকে তুই সব খুলে বল !

আমাকে একজন ডাকছে, আমি যেতে চাই না, তবু আমাকে যেতেই হবে!

কে ডাকছে?

ক'দিন আগে একটি মারাঠী ছেলে এসেছিল, তুই দেখেছিলি? যাকে নিয়ে আমি সাইকেল রিক্সায় ঘুরছিলাম।

হ্যাঁ দেখেছি। ভাল নাচেন বোধহয় তাই নয়? চেহারা দেখে তাই মনে হয়।

হুঃ। নাচ-গান কিছু জানে না। অঙ্কের পণ্ডিত! আমেরিকায় থাকে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কলকাতায় সামান্য একটু আলাপ হয়েছিল, আমার গান শুনেছিল। কোনদিন আমাকে চিঠি লেখেনি, কিছু না। আমেরিকাতে বসে নাকি শুধু আমার কথাই ভেবেছে, সেখান থেকে এই যে সেদিন এলো, আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য! তুই এটা বিশ্বাস করতে পারিস?

না।

কেন তুই তাকে অবিশ্বাস করবি। তুই তার সঙ্গে একটু কথা বললেই বুঝতে পারতিস, সে মিথ্যে কথা বলার মানুষ নয়।

সে তোকে নিয়ে যেতে চায়?

হ্যাঁ।

কোথায়? বোম্বেতে?

কী জানি কোথায়?

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস হাসি? ওরকম চোখের ভাললাগা তো অনেকেরই লাগে। এখানে কতজন তোকে—।

তপন আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি রে! ও সেই যে শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেল, তারপর প্রত্যেকদিন, জেগে থাকার সবটা সময় আমি শুধু ওর কথাই ভাবছি। এ যেন একটা চুম্বক, আমাকে অনবরত টানছে! আমি কিছুতেই নিজের মনটা ফেরাতে পারছি না অন্যদিকে।

তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

না না না, আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে কিছুতেই যাব না। আমি গান ছাড়তে পারব না, আমি তোকে ছাড়তে পারব না! আমি শুধু ওকে আর একবার দেখতে চাই! এরপর তপনের হাত দিয়েই একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হাসি। অজয়কে লিখল, বিদেশে ফেরার আগে আপনি আর একবার শান্তিনিকেতনে আসতে পারেন?

দুদিন পরে আবার একটি সাইকেল রিক্সা এসে থামল হাসিদের বাড়ির সামনে। হাসি তখন ক্লাস করতে গেছে। হাসির বাবা অজয়ের সঙ্গে এমন ভাবে

গল্প করতে লাগলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। যদিও তপনের কাছ থেকে তিনি সবই শুনেছেন।

তিনি শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিনিকেতন জায়গাটা আপনার খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি? পর পর দু'বার এলেন?

অজয় পরিষ্কার উত্তর দিলেন, আমি হাসির সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। হাসি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হাসিকে খবর দেওয়া হল। সে এসে অজয়কে দেখেই যেন রাগে জ্বলে উঠল। যেন অজয় একজন অনভিপ্রেত অতিথি। সে বেশ কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে ফিরে এলেন? আপনার আজই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল না?

অজয় হেসে বললেন, তাহলে কি অন্য কেউ মজা করার জন্য আপনার নামে আমার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল?

হাসির বাবা অল্প বয়েসীদের এই সব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাইলেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হাসি তাঁকে ডেকে বলল, বাবা, শোন, এই লোকটা আমাকে বিরক্ত করছে! জ্বালিয়ে মারছে। এর জন্য আমি রাত্তিরে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না।

অজয় তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, আপনার মেয়েকে যদি আমি বিরক্ত করে থাকি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে এবারের মতন আমাকে মার্জনা করুন। আমি শপথ করছি, আমি জীবনে আর কোনদিন এই শান্তিনিকেতনে পা দেব না।

অজয়ের নম্র, বিষণ্ণ স্বর শুনে বাবা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, না, না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার মেয়েটা একেবারে পাগল, কখন যে কী করে মাথার ঠিক নেই। আপনি বসুন, চা-টা শেষ করুন।

কিন্তু অজয় আর দাঁড়ালেন না। হাসির দিকে একবারও না তাকিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের আগে ট্রেন নেই। দুপুরটা অজয়কে টুরিস্ট লজেই কাটাতে হবে। দরজা বন্ধ করে তিনি ঘুম দিলেন। একটু পরেই দরজায় দুম দুম শব্দ হল।

দরজা খুলতেই হাসি ঝড়ের বেগে ঢুকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, আপনি...আপনি অতি নিষ্ঠুর! কেন বললেন যে জীবনে আর কোনদিন শান্তিনিকেতনে পা দেবেন না? শান্তিনিকেতন কি আমার একলার? গুরুদেবের জায়গায় যে-কেউ আসতে পারে।

অজয় কিছু না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হাসির মুখের দিকে।

হাসি আবার বলল, আপনি...তুমি...শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেও না, তুমি এখানেই থাক। বিদেশে যাবার কি দরকার? আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যে যেতে পারব না?

সেই প্রথম অজয় এগিয়ে এসে হাসির হাত ধরে টেনে তুলে তাকে বুকের ওপর এনে বললেন, তুমি চল, কয়েক বছর মাত্র আমরা বিদেশে থাকব। তারপর আবার আমরা ফিরে আসব। তোমার গান বন্ধ হবে না!

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবাহ-উৎসবের পরই অজয় ফিরে গেলেন আমেরিকায়। হাসিকে থেকে যেতে হল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার আর তিনমাস বাকি, কিন্তু সেই সময়টাই হাসির মনে হল বিরাট লম্বা। যে শান্তিনিকেতনকে এত ভালবাসত হাসি, সেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার জন্য সে ছটফট করতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হবার পরদিনই হাসি দমদম থেকে প্লেন ধরল।

অজয় থাণ্ডেলকরকে বিদেশে থাকতে হল সাত বছর। মাঝখানে হাসি একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য মা-বাবার কাছে ঘুরে গিয়েছিল। বিদেশে হাসির স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে, চোখে-মুখে এসেছে অন্যরকম দীপ্তি, সব সময় সে আনন্দ-উজ্জ্বল, বিয়েটা তার খুবই সার্থক হয়েছে।

সাত বছর বাদে যখন বিদেশে পাকাপাকি বসবাস কিংবা সবকিছু গুটিয়ে দেশে ফেরার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এলো তখন হাসির দেশ সম্পর্কে টান অনেকটা কমে গেছে। ওখানে থেকে যাওয়াই তার ইচ্ছে। কিন্তু অজয়ই ফিরতে চাইলেন। দেশ তাঁকে টানে। হাসিকে তিনি ফিরিয়ে আনবেন এই কথা দেওয়া ছিল!

দু'তিন জায়গা থেকে চাকরির অফার পেয়েছিলেন অজয়, তার মধ্যে দিল্লিরটাই সবচেয়ে ভাল ছিল, তবু অজয় কলকাতার চাকরিটাই নিলেন।

সাত বছর পর হাসি তার ফুটফুটে শিশুপুত্রের হাত ধরে ফিরে এলো শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় পছন্দমতন বাড়ি পাওয়া যায়নি, অজয় থাকছেন কোম্পানির গেস্ট-হাউসে, হাসি কিছুদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে যাবে।

কিন্তু এই ক'বছরেই শান্তিনিকেতন যেন অনেক বদলে গেছে। হাসির বন্ধু-বান্ধবীরা প্রায় কেউই নেই। শান্তিনিকেতনের গাছপালাও হাসিকে চিনতে পারল না। তপন থাকে দুর্গাপুরে, সেখানে গানের স্কুল খুলেছে, মাঝে মাঝে বাংলা সিনেমায় উপ-নায়কের পার্ট করে। বয়স্ক নারী-পুরুষরা ছাড়া আর কেউ হাসির সঙ্গে যেচে কথা বলে না। গানের জন্য এক সময় হাসির কত নাম ছিল, সেকথা কেউ মনে রাখেনি। এমন কি মোহরদিও তার নামটা ভুলে গিয়েছিলেন।

হাসিও অবশ্য গানের চর্চা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। অজয় ব্যবস্থা করেছিল সবরকম, দেশ থেকে হারমোনিয়াম আর তানপুরা আনিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আধুনিকতম রেকর্ড-ক্যাসেট কিছুই বাদ দিল না। তবু হাসির উৎসাহ চলে গেছে আস্তে আস্তে। শান্তিনিকেতনে সবাই মিলে রিহার্সালের মজা কতরকম মজা, মাঝে মাঝে কলকাতায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়া, অন্য গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা, তার নেশাই ছিল অন্যরকম। বিদেশে সারাক্ষণ কাজ করতে হয়, তারপর সন্তান জন্মের পর হাসি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে মাঝে মাঝে আপন মনে দু'চার লাইন গেয়ে ওঠে বটে, কিন্তু সে আর গানের জগতে নেই।

হাসি গায়িকা হয়নি বটে কিন্তু সে সুখী জীবন পেয়েছে। কিংবা খুব সহজেই সুখটাকে মেনে নিয়েছে বলে সে শিল্পী হতে পারল না।

তিন

সেদিন এমন কিছু নেশা হয়নি দিব্যর যে পরবর্তীদিন সে কথা মনে থাকবে না।

লজ্জিত হবার চেয়েও সে বিস্মিত হয়েছিল অনেক বেশি। কেন সে অমন-ভাবে অনসূয়া থাণ্ডেলকরের কাছে ছুটে গিয়েছিল অত রাতে? এটা তো নিছক অন্যমনস্কতা নয়! এতো পাগলামি। অনসূয়ার সঙ্গে তার অতি সামান্য আলাপ, ভদ্রমহিলার চেহারা সুন্দর, ব্যবহারও বেশ ভাল, সকলেই তাকে পছন্দ করে। দিব্যর ক্ষেত্রেও তার বেশি কিছু নয়, সে অনসূয়ার প্রেমে পড়েনি, তাকে নিয়ে সে কোন স্বপ্নও দেখে না। তাহলে?

দিব্য বেশ ভয় পেয়ে গেল। তার মেজমামা এমনই হিংস্র উন্মাদ যে তাঁকে বছরের পর বছর একটা নার্সিং হোমে রাখতে হয়। দিব্যর মধ্যেও সেই পাগলামির বীজ ঢুকেছে নাকি?

দিব্য দু'তিনদিন খুব মন-মরা হয়ে রইল। অফিসে গেল না। কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার কথা চিন্তা করেও যেতে সাহস হল না। সে চুপচাপ বাড়িতে শুয়ে কাটাল।

ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে কি বলে দিয়েছেন সেই রাত্রির ঘটনা? বলাটাই স্বাভাবিক।

দিব্য অজয় থাণ্ডেলকরের অধীনে কাজ করে না, তার অফিস আলাদা, কিন্তু তার অফিসের স্বার্থে তাকে প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়। তার অফিস থেকেই মাঝে মাঝে পার্টি দেওয়া হয়, অনসূয়া থাণ্ডেলকর সেখানে আসেন।

দিব্য বিষণ্ণ ভাবে ভাবল, হয়তো এই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। অজয়

খাণ্ডেলকর তার নামে অভিযোগ করলে দিব্যদের অফিসের জি. এম. আর. দিব্যকে রাখবেন না। কারণ অভয় খাণ্ডেলকরের মূল্য অনেক বেশি। যদিও দিব্যর নামে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ শুনলে জেনারেল ম্যানেজার প্রথমটায় একেবারে হাঁ হয়ে যাবেন।

চেষ্টা করলে দিব্য একটা অন্য চাকরি পেয়ে যাবে। তার যোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অফিসটা তার বেশ পছন্দ ছিল। চাকরি জীবনে মাইনে ছাড়াও পছন্দ মতন সহকর্মী পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার।

চারদিন পরে দিব্য আবার অফিসে গেল এবং কারুর মুখে কোন বাঁকা কথা শুনল না। কেউ কিছু জানে না। সবই আগের মতন স্বাভাবিক।

কিন্তু দিব্যর ব্যবহার অনেক আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে মেপে মেপে কথা বলে। যে কোন জায়গায় যাবার আগে সে ভেবে নেয় ঠিক জায়গায় যাচ্ছি তো? বাথরুম থেকে বেরুবার আগে সে অন্তত তিনবার দেখে নেয় জামা প্যান্ট ঠিক মতন পরা হয়েছে কিনা!

শনিবার তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অশোক বাজপেয়ীর বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন ছিল, দিব্য কায়দা করে এড়িয়ে গেল। অশোকের বাড়িতে গেলেই খুব মদ্যপান হয়, অশোক খুব জোর করে। দিব্য এখন বেশ কিছুদিন আর মদ ছুঁতে চায় না। যথেষ্ট মদ খেলেও তার নেশা হয় না এই গর্ব ছিল, এক সন্ধেবেলা সব উল্টে গেল। এয়ারপোর্ট হোটেল থেকে সে ছুটে গেল যোধপুর পার্ক, এটা মাতলামি না পাগলামি?

মহাশ্বেতা। নামটা একেবারে কাল্পনিক নয়। কিন্তু কতদিন আগে হারিয়ে গেছে সেই মহাশ্বেতা। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঘাটশিলায়, তখন দিব্যর বয়েস একুশ-বাইশ হবে। তার গায়ে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গন্ধ।

মহাশ্বেতারাও বেড়াতে এসেছিল। মহাশ্বেতাদের খুব বড় পরিবার! এক দঙ্গল লোক! মহাশ্বেতার বয়েস সতেরো-আঠারো হবে। তার বয়েসী আরও দুটি মেয়ে ছিল ওদের দলে। তাদের নাম মনে নেই। পাশাপাশি বাড়িতে থাকা তাই আলাপ পরিচয় হবেই। তারপর কিছু হাসি-ঠাট্টা, এক সঙ্গে বেড়ানো, কোন একজনের দিকে গাঢ় চোখে তাকানো, এর বেশি আর কিছু না।

দিব্য তখন খুব লাজুক ছিল। অন্য অনেক ছেলে যেমন কথার পিঠে চালাক চালাক কথা বলে, সে ক্ষমতা তার একেবারেই ছিল না। মহাশ্বেতার সঙ্গের অন্য দুটি মেয়ে বরং বেশ স্মার্ট। মহাশ্বেতা একটু চুপচাপ ধরনের।

ঐ তিনজনের কোনো একজনের সঙ্গেই দিব্যর প্রেম হয়নি, মনে রাখবার মতন কিছু ঘটেওনি।

শুধু একটা বিকেলে, সেদিন বোধহয় ধারাগিরির দিকে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল একসঙ্গে, মহাশ্বেতা তাকে বলেছিল, আমার মাঝে মাঝে ভীষণ মন খারাপ হয়। কোন কারণ নেই, এমনি এমনি, কেন যে হয় বুঝতে পারি না। কী করে মন খারাপ ভাল করা যায় বলতে পারেন?

অতিরিক্ত লাজুক লোকেরা অনেক সময় রূঢ় হয়। সেই রকম ভাবেই দিব্য বলেছিল, আমি কী করে জানব, আমি কী ডাক্তার?

মহাশ্বেতার মুখখানা ডিমের মতন। তার মুখের রঙ চাপা জ্যোৎস্নার মতন। ভুরু দুটি খুব গভীর। তখনও তার ভুরু প্লাক করার বয়েস হয়নি। খুব একটা সাজগোজের দিকেও মনোযোগ ছিল না।

গভীর ভুরু দুটি তুলে আহত বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলেছিল, যাঃ শুধু ডাক্তাররাই বুঝি মন খারাপের কথা বোঝে? আর কেউ বোঝে না? এই যে বিকেলের আলো কমে আসছে, একটা দিন চলে যাচ্ছে, আকাশটা কী রকম হারিয়ে যাচ্ছে, এই সময়টায় আমার বেশি করে মন খারাপ হয়। আপনার হয় না?

দিব্য বলেছিল, না।

মহাশ্বেতা বলেছিল, আপনি বুঝি খুব গোঁয়ার? শুনেছি গোঁয়ার লোকদের মন খারাপ হয় না। আপনার সত্যিই কখনও হয় না?

দিব্য আবার বোকার মতন বলেছিল, না!

মহাশ্বেতা বেশ কয়েক মুহূর্ত দিব্যর চোখের দিকে চেয়ে থেকে খুব নরম ভাবে বলেছিল, শুধু এই সব মানুষদের আমার ভয় করে।

তারপর সে আস্তে আস্তে একা হেঁটে গিয়েছিল জঙ্গলের দিকে।

লাজুক দিব্য তখন এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে মহাশ্বেতাকে সে ভুল কথা বলেছে। মহাশ্বেতা মনে একটু আঘাত পেয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কথা তাকে বলা উচিত ছিল তা দিব্যর মনে পড়েনি।

মহাশ্বেতা যখন একলা চলে গেল তখনও সে একটা পাথরের ওপরেই বসে রইল, ওর সঙ্গে গেল না। মহাশ্বেতার সঙ্গে ঠিক কোন কথা বলতে হবে, সেটাই যে সে জানে না।

মহাশ্বেতার সঙ্গে দিব্যর আর কোনদিন দেখা হয়নি। দিব্য যদি চালু ছেলে হত, তাহলে মহাশ্বেতাকে কলকাতায় ঠিকই খুঁজে বার করত, যোগাযোগ রাখত। কিন্তু দিব্য তখন ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে ধারাগিরির কাছে সেই বিকেলটার কথা মনে পড়ত। মহাশ্বেতাকে কী উত্তর দেওয়া উচিত ছিল?

বছর দেড়েক বাদে দিব্যর ছোট বোন একদিন বলল, দাদা, ঘাটশিলায় সেই

যে মহাশ্বেতা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মনে আছে! ইস্‌ কী কাণ্ড?

মহাশ্বেতার লম্বাটে মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল দিব্যর। হ্যাঁ তাকে মনে আছে, অন্য কোন কারণে নয়, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি বলে।

দিব্য জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তার?

ঝিনি বলল, আজ কাগজে দ্যাখোনি? সে আত্মহত্যা করেছে। কাগজে লিখেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মহাশ্বেতা সেনগুপ্ত স্লিপিং পিল খেয়েছে, তার আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি।

তৎক্ষণাৎ দিব্যর মনে পড়ে গিয়েছিল মহাশ্বেতার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা। দিব্যর বলা উচিত ছিল, আমাকে তোমার মন খারাপের খানিকটা ভাগ দাও! সৌম্যর লোকদের শিখিয়ে দাও, কী করে মন খারাপের ভাগ নিতে হয়!

সেইদিন ধারাগিরির কাছে বিকেলে ঠিকঠিক ভাবে মহাশ্বেতাকে এই কথাটা বলতে পারলে হয়তো সে আত্মহত্যা করত না। হয়তো এই প্রশ্ন সে আরও কারুর কারুর কাছে করেছে, কেউ সঠিক উত্তর দেয়নি!

তারপর কতদিন কেটে গেছে, একেবারে হারিয়ে গেছে মহাশ্বেতা। দিব্য তার বুকের মধ্যে কোন অপরাধবোধ পুষে রাখেনি। কেনই বা রাখবে?

অনসূয়ার সঙ্গে তো মহাশ্বেতার কোনই মিল নেই! যতদূর সে জানে, অনসূয়া খাণ্ডেলকরের জীবন খুব সুখী আর পরিতৃপ্ত। দিব্য তার কাছে কেন গিয়ে বলবে…। না, দিব্য কিছুতেই তার নিজের ব্যবহারের যুক্তি খুঁজে পায় না।

সোমবার দিব্য অফিসে গিয়েই শুনল যে অজয় খাণ্ডেলকর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জেনারেল ম্যানেজার বললেন, শোন দিব্য মিঃ খাণ্ডেলকর তোমায় বেশ পছন্দ করেন, আমি আগেও লক্ষ করেছি। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। মিঃ খাণ্ডেলকরকে আমরা উইথ ফ্যামিলি কাশ্মীরে একটা গুড ট্রিটমেন্ট দিতে চাই। ওখানে আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন করব। সেটা হবে প্রধানত ওঁরই জন্য। তোমাকে খুব কায়দা করে কথাটা পাড়তে হবে। উনি যেন বুঝতে না পারেন যে ওঁর জন্য স্পেশাল কিছু করা হচ্ছে। তুমি ওঁর কাছ থেকে একটা ডেট নিয়ে এস। তুমি এটা পারবে, আমি জানি।

দিব্য মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা আমি চেষ্টা করব।

দিব্য অবশ্য মনে মনে ঠিকই বুঝেছে, শুধু তাঁকে আলাদা করে ডাকার ব্যাপারটা

কী! অজয় খাণ্ডেলকর খুব কড়া ধরনের নীতিবাগিশ মানুষ। বাইরে অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু নিজের বিশ্বাসে সব সময় স্থির থাকেন। এইবারে তিনি দিব্যকে নিজের চেম্বারে বসিয়ে গালের ছাল ছাড়াবেন।

দিব্যকে হয়তো আজই চাকরিটা ছাড়তে হবে, তবু সে ঠিক করল তার যাওয়া উচিত। নইলে ছিঁচকে অপরাধীর মতন মনে হবে নিজেকে। অজয় খাণ্ডেলকর যা খুশি বলার পর সে ক্ষমা চাইবে।

অজয় খাণ্ডেলকর বসেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের উঁচু বাড়ির ষোলতলায়। তাঁর ঘর থেকে সম্পূর্ণ ময়দান ও তার একপ্রান্তে গঙ্গার বাঁক দেখতে পাওয়া যায়। খিদিরপুরের জাহাজগুলো দেখা যায় স্পষ্ট।

অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দিব্যর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, আসুন আসুন। ওঃ, আজ রোদ বড় চড়া, আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। একটা খুব জরুরি পয়েন্ট ক্লিয়ার করার কথা, সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছি।

সত্যিই অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরি ব্যাপার। অজয় কোনো রকম ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুললেন না। একটা ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যাপারে দিল্লি থেকে আপত্তি জানিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি তার উত্তর পাঠাতে হবে। প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে দুজনে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করল।

তখনও কাজ বাকি থেকে গেল খানিকটা। কিন্তু অজয়কে বেরুতে হবে, তাঁর আর একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে অজয় বললেন, আমি দুঃখিত, দিব্যবাবু, কাজটা শেষ করা গেল না। অথচ কালই উত্তর পাঠানো দরকার।

দিব্য বলল, আমি কাল সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসতে পারি।

অজয় হুঁ, বলে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলেন।

দিব্য এই সুযোগে কাশ্মীরের প্রস্তাবটা পেড়ে ফেলল। অজয় সে সম্পর্কে বেশি আগ্রহ প্রকাশ না করে বললেন, ওসব পরে ভেবে দেখা যাবে। আপনি আজ সন্ধেবেলা বিশেষ কিছু করবেন? ফ্রি আছেন?

দিব্য একটু অবাক হয়ে বলল, না তেমন কিছু নেই। কেন বলুন তো!

অজয় হেসে বললেন, আমি ভাবছিলুম, আপনি যদি আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে আসতে পারেন। কাজটাও শেষ করা যায়, খানিকটা গল্পগুজবও করা যায়। অফিসের সময়টায় তো আমরা সবাই যন্ত্রের মতন, তাই না? যেন আমাদের কোন সামাজিক পরিচয় নেই।

দিব্য চুপ করে চেয়ে রইল।

কোনো অসুবিধে আছে?

না।

তাহলে চলে আসুন। আমার বাড়ি চেনেন তো! এই সাড়ে সাতটা নাগাদ! হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই খেয়ে নেবেন! তা হলে ঐ কথা রইল?

দিব্য একবার জানলা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকাল। এত উঁচু থেকে সব কিছুই সুন্দর দেখায়। এখান থেকে আত্মহত্যা করা কত সোজা। একটুও ভয় করবে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দিব্যর মনে হল, অজয় খাণ্ডেলকর কি একটা ফাঁদ পেতে তার মধ্যে দিব্যকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোনরকম ধূর্তামির চিহ্ন নেই। তাঁর এই যে ভালমানুষী ব্যবহার, এর সবটাই অভিনয় হতে পারে?

কিন্তু অজয় খাণ্ডেলকর অফিসের কাজে কোনদিন কারুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছেন, এরকম শোনাই যায় না!

তবে কি সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্ন? সেদিন রাতে দিব্য যায়নি যোধপুর পার্কে? কিন্তু তার মানি ব্যাগ, ঘড়ি খোয়া গিয়েছিল…

অফিস একটু ছুঁয়েই বাড়ি চলে এল দিব্য। তারপর বেশ খানিকক্ষণ ঘুমলো। ঘুম থেকে উঠে খুব ভালভাবে স্নান করল। ঘুম আর স্নান, এই দুটোতেই মন বেশ স্নিগ্ধ থাকে অনেকক্ষণ। মনের এই রকম অবস্থায় নিজে বেশি কথা না বলে অন্যের কথা শুনতে ইচ্ছে হয়।

সাদা ট্রাউজার্স আর সাদা শার্ট পরলো। সাদা পোষাকেও বেশ উজ্জ্বল লাগে তার। ঠিক সাড়ে সাতটায় সে এসে পৌঁছল যোধপুর পার্কে। আশ্চর্য, আজ তাকে বাড়িটা খুঁজে পেতে ট্যাক্সি নিয়ে বেশ ঘুরতে হল খানিকক্ষণ।

পাজামা ও পাঞ্জাবী পরে অজয় খাণ্ডেলকর বসবার ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। দিব্য ঢুকতেই তিনি সহাস্যে বললেন, একটা ভাল খবর আছে। ইমপোর্ট লাইসেন্সের সেই প্রবলেমটা সলভ্ করে ফেলেছি এর মধ্যেই। ফাইলটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালেই পাঠিয়ে দেবেন, কেমন?

দিব্য তখনও বসেনি, ফাইলটা হাতে নিয়ে সে ভাবল, তা হলে আর এখানে থাকবার তো কোন প্রয়োজন নেই, এখন চলে গেলেই তো হয়।

সে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আমি আসি তাহলে?

অজয় ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, সেকি, বসুন! আমি তো আপনাকে সোশ্যালি ইনভাইট করেছি। ভালই হল, অফিসের কথাবার্তা আর বলতে হবে না, তাই না?

দিব্যর মনে হচ্ছে, সত্যিই সে একটা ফাঁদে এসে পড়েছে। অজয় খাণ্ডেলকরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারছে না। কী চান উনি?

অজয় জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কী ড্রিঙ্ক দেব?

অনেক অনুরোধেও দিব্য কোনোরকম মদ নিতে রাজি হল না। সে একটা নরম পানীয় নিয়ে অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগল।

অজয় জিজ্ঞেস করলেন, একটা কিছু গান দেওয়া যাক। আপনি গান ভালবাসেন নিশ্চয়ই? কোন্ ধরনের গান? রবীন্দ্রসঙ্গীত?

দিব্য মাথা নাড়ল।

অজয় একটা ক্যাসেট রেকর্ডার কাছে নিয়ে এসে বললেন, আপনি কি জানেন, আমার স্ত্রী এক সময় ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন?

দিব্য মাথা নেড়ে জানালো যে সে তা জানে না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। আমার স্ত্রী, যখন তিনি আমার স্ত্রী ছিলেন না, তাঁর গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে তিনি গান একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিছু তো একটা বলতে হবে, তাই দিব্য বলল, আপনারা তো অনেকদিন বাইরে ছিলেন।

হ্যাঁ, সাত বছর। খুব দীর্ঘ সময় তাই না? কিন্তু বিদেশেও তো অনেকে গান-বাজনার চর্চা রাখে। বনানী ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল চালান। আমরা যেখানে ছিলাম, তার কাছেই আলী আকবরের মিউজিক স্কুল। আমার স্ত্রী তবু গেল না।

দিব্য ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অজয় খাণ্ডেলকর শুধু স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথা বলছেন। এই জন্যই তিনি দিব্যকে ডেকে এনেছেন।

অজয় ক্যাসেট রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলেন। নারী কণ্ঠের একটা গান শুরু হল। 'দিন যায়, যায় রে!' টানা সুরের গান, গভীর বিষাদে ভরা। কণ্ঠস্বর খুব গভীর। গানটা যেন ঐ গায়িকার একেবারে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে। দিব্যর কাছে এই কণ্ঠস্বর অচেনা।

দুজনে নিঃশব্দে গানটি শুনল। ঐ একটা গান শেষ হবার পরই অজয় যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলেন।

দিব্য জিজ্ঞেস করল, এটা কার গান?

হাসি রায়ের। আপনি নাম শুনেছেন?

না।

হাসি রায়ের ভাল নাম ছিল অনসূয়া। এখন তিনি আমার স্ত্রী। এই গানটা উনি গেয়েছেন চারদিন আগে। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর আমি ওঁর গলায় একটা পুরো গান শুনলাম। রাত্রিবেলা, অনেক রাত্রি তখন, দুটো-আড়াইটে হবে,

ঘুম ভেঙে গেল, আমি দেখি, আমার স্ত্রী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, এই গানটা গাইতে গাইতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। আমাদের বিবাহিত জীবনে তাঁকে কোনদিন কষ্ট পেতে দেখিনি, আমি তাঁকে সবরকম সুখে রাখতে চেয়েছি। বরং আমারই মনে একটা দুঃখ ছিল উনি গান ছেড়ে দিয়েছেন বলে।

কেন গান ছেড়ে দিয়েছিলেন ?

জানি না। কোনদিন তো বলেননি। সেদিন মাঝরাতে ওঁকে এই গানটা গাইতে শুনেই আমি ক্যাসেটটা চালিয়ে দিই। তারপর গান শেষ হল, উনি তবু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। 'দিন যায়, যায় যে।' গানের কথাগুলো লক্ষ্য করেছেন ? তা হলে কি ওঁর দিনগুলো এইরকম দুঃখেই কাটছে, যা আমি খবর রাখি না ? আমি তখন হাসির কাছে গিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কিসের এত দুঃখ ? আমি কি কিছু ভুল করেছি। উনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আমার বুকে মাথা রাখলেন। আমি তাঁর চুলে হাত বুলোতে লাগলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে উনি বললেন, সত্যি আমার কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই। কিন্তু ক'দিন আগে একজন লোক এসে আমার মন খারাপ করে দিয়ে গেছে !

দিব্য সামনে ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুলভাবে বললেন, মিঃ খাণ্ডেলকর, আমি···

অজয় তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান আমি আগে শেষ করে নিই ! হাসির মুখে ঐ কথা শুনে আমি স্বাভাবিকভাবেই অবাক হলুম। জিজ্ঞেস করলুম, রাত্তিরবেলা একজন লোক এসেছিল ? কে ? হাসি বললেন, ঘটনাটা তোমাকে জানাতে চাইনি, ড্রিংক করে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এরকম পাগলামি করে, পরের দিন সেজন্য খুব লজ্জা পায়। এ নিয়ে বেশি রাগারাগি বা কোন রকম অ্যাকশন নেওয়া উচিত নয়। দিব্য ছেলেটিকে দু'একদিন না দেখেছি, এমনিতে খুব ভদ্র। সে রাত্তিরে এসে আমার সঙ্গে কোনরকম অসভ্যতা করেনি, শুধু বারবার বলছিল, তোমার নাম মহাশ্বেতা ! কেন ওরকম বলছিল ? তারপর থেকেই আমার ভীষণ মন খারাপ লাগছে। আমি কিছুতেই মনটা ঠিক করতে পারছি না। আমার কান্না এসে যাচ্ছে।

দিব্য মাথা নিচু করে বসে রইল।

অজয় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কেন এসেছিলেন আমি জানি না। জানতেও চাই না। কিন্তু আপনি আমার উপকারই করেছেন। আপনি হাসির গলা থেকে আবার গান বার করে এনেছেন। দাঁড়ান, হাসিকে ডাকি।

অজয় চট করে চলে গেলেন ভেতরে। দিব্য একলা বসে থেকে ঘামে ঘেমে

যেতে লাগল। এখন কী করা উচিত, কী বলা উচিত, কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে শ্রীমতী অনসূয়া খাণ্ডেলকর ঘরে ঢুকলেন একা। মুখখানা দেখে মনে হয় বিষাদ প্রতিমা। দিব্যর সামনে এসে বসলেন।

দিব্যর হাত-পা কাঁপছে। জীবনে সে কখনও এত নার্ভাস বোধ করেনি। কেন সে এখানে এলো ? পরদিনই তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বাইরে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

মুখ তুলে দিব্য গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, আমি দুঃখিত। সেদিনের ব্যবহার যদিও অমার্জনীয়, তবু আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাইছি।

হাসি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন এসেছিলেন ?

আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি কোনোদিন কারুর সঙ্গে এরকম··· আমি নিজেই আমার ব্যবহারের মানে বুঝতে পারছি না ! কেউ যেন আমাকে জোর করে টেনে এনেছিল।

মহাশ্বেতা কে ? আপনি কেন বলছিলেন, আমার নাম মহাশ্বেতা ?

তাও আমি ঠিক জানি না। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে, আমি ভেবেচিন্তে কিছু বলিনি। কেন যে আপনাকে মহাশ্বেতা বললুম।

ঐ নামে কেউ ছিল ?

ছিল, অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছে !

ওকে নিয়ে আপনার নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট ছিল বুকের মধ্যে ? সেই কষ্টটা আপনি আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ঐ নাম। কেন আমাকে মহাশ্বেতা বলেছিলেন, ভাবতে গেলেই কান্না পেয়ে যায়। সেই কান্না হঠাৎ একদিন গান হয়ে বেরিয়ে এলো। আমি যেন একটা, কী বলব, যেন একটা সুখের কাচের মধ্যে ছিলুম, হঠাৎ কী করে ঢুকে পড়ল দুঃখ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অজয় বললেন, এজন্য দিব্য বাবুকে আমাদের দু'জনেরই ধন্যবাদ জানানো উচিত। তাই না ? হাসি, তুমি এবারে আমাদের একটা গান উপহার দাও ! তানপুরাটা আনি ?

হাসি আর একটা গান শুরু করল। চির সখা হে, ছেড়ো না ! এ গানেও দুঃখের সুর।

গান শুনতে শুনতে দিব্যর চোখে জল এসে যাচ্ছে। কবে, কোথায় হারিয়ে গেছে মহাশ্বেতা। এখন তার মুখটাও আর দিব্যর মনে নেই। তবু সেই মহাশ্বেতার মন খারাপ কী করে যেন সুর হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে হাসির কণ্ঠ দিয়ে। হাসি এখন সত্যিই মহাশ্বেতা।

প্রথম উপহার

দফ্‌তরিখানা খোলবার আগেই পৌঁছে গেল প্রদীপ। একটা নয়, তিনখানা তালা ঝুলছে দরজায়। প্রদীপ শুধু হতাশ হলো না, অবাকও হলো খুব। তার ধারণা ছিল, এই দফ্‌তরিখানা বন্ধ হয় না। দফ্‌তরিরা এই ঘরের মধ্যেই থাকে। গতকাল রাত পৌনে নটা পর্যন্ত সে এখানে ছিল। দফ্‌তরিরা সব লুঙ্গি পরা আর খালি গা, কাজের মাঝে মাঝেই ওরা আটা মাখা হাতে অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, একজন ঘুমোচ্ছিল মাদুর পেতে। প্রদীপ ভেবেছিল, এখানেই ওদের বাড়ি ঘর।

জায়গাটা আধা বস্তি ধরনের। একদিকে কয়েকটা পাকা বাড়ি, তার পরেই সারি সারি গোলার চাল, টালির চালের ঘর। একটা টিউবওয়েলের সামনে এক দঙ্গল স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদের ভিড়। ঘর্ষণ শব্দ হচ্ছে টিউবওয়েলটার হাতলে। প্রদীপ একবার লিখেছিল, 'টিউবকলের আর্তনাদ'! পরে অবশ্য বুঝেছে, লোহার কোনো কষ্ট নেই, তারা কাঁদে না, ঐ আর্তনাদ আসলে মানুষগুলোর।

দফ্‌তরিরা কি এই বস্তির মধ্যেই থাকে?

প্রদীপ ভাবলো কারুকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক ও বাচ্চার দল ছাড়া আর তো কাছাকাছি কেউ নেই। তাহলে একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক।

পাঞ্জাবীর পকেটে দুটি সিগারেট, প্রদীপ তার থেকে একটা বার করলো। একটু দুমড়ে গেছে, কিন্তু ফাটে নি। হাত দিয়ে সিগারেটটা সোজা করে তারপর ধরালো দেশলাই জ্বেলে। সঙ্গে সঙ্গে কাশির দমক। সিগারেট তার সহ্য হয় না, তবু সে ফেলে দিল না।

সকাল এখন পৌনে আটটার বেশি নয়। দফ্‌তরিখানা কখন খোলে?

কাল সেটা জিজ্ঞেস করা হয় নি। কাল পার্থ আর সুবিমল ছিল প্রদীপের সঙ্গে। কালই বই পাওয়ার কথা ছিল। ফর্মা ভাঁজ করা, সুতো সেলাই, পুস্তানির কাগজ ও মলাট লাগানো পর্যন্ত তারা দেখেছে। তবু তারা বই পায় নি। এর পর নাকি অন্তত আট ঘণ্টা বই চাপে না রাখলে বই বেঁকে যায়। প্রদীপের এটা জানা ছিল না। দফ্‌তরিখানার মালিক বললো, এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? কাল সকালে দেখবেন বইয়ের চেহারা খুলে গেছে।

সকাল মানে কত সকাল? সারা রাত প্রদীপের ঘুমই হয় নি ভালো করে। তার প্রথম বই! ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে প্রদীপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে কাল, তার দু' একটা মনে পড়লে তার নিজেরই লজ্জা করছে। প্রথম বই বেরুনো মাত্র চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে, এরকম আশা করা যায় না। কিংবা যেতেও তো পারে! সুবিমল বলেছিল....।

টিউবওয়েলের সামনের মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন বলছে চেঁচিয়ে। প্রদীপের সম্পর্কেই নাকি? মেয়েরা চান করছে ওখানে, কারুর বুকে জামা নেই। কিন্তু প্রদীপ তো ওদের দিকে ভালো করে চেয়েই দেখে নি। তবু একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা...

প্রদীপ হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় চলে এলো। সুবিমল আর পার্থ দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে এসে পড়বে বলেছিল, কিন্তু প্রদীপ আর থাকতে পারছিল না বাড়িতে। তিনটে তালা ঝুলছে, কী এমন মূল্যবান সম্পত্তি থাকে দফ্‌তরি-খানায়?

—এই যে, এসে গেছেন এর মধ্যে?

প্রদীপ চমকে উঠলো। দফ্‌তরিখানার মালিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। যার জন্য প্রদীপ এতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছে, সে যে কখন সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে গেল, তা প্রদীপ লক্ষ্যই করে নি। সে যে-দিকে চেয়ে আছে সে দিকে কিছুই দেখছে না।

পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, এখন অন্যরকম দেখালো মালিকটিকে। কাল একেও গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখেছিল প্রদীপ। দফ্‌তরিখানার মধ্যে খুব গরম।

মালিকের নাম মুজিবর রহমান। নাম শুনে প্রদীপ আর তার বন্ধুরা চমকে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর নামে নাম। শুধু এই নামের জন্যই লোকটির প্রতি আন্তরিক সম্ভ্রম জেগেছিল!

পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে তিনটি তালা খুললেন তিনি। কোথা থেকে দু'জন দফ্‌তরিও হাজির হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। তা হলে এরা এই

বস্তিতেই থাকে।

রহমান সাহেব একজনকে বললেন, একখানা বই আগে আমার হাতে দে।

হট প্রেস মেশিনটা প্রকাণ্ড, তার মধ্যে শুধু প্রদীপের বই। এই জন্যই দরজায় তিনটে তালা ছিল। প্রদীপের বই কত মূল্যবান এরা বুঝেছে!

রহমান সাহেব একটা বই নিয়ে মলাটের বোর্ড টিপে টিপে দেখলেন, সেলাই পরীক্ষা করলেন, পুস্তানির কাগজ ধরে একবার টান মারলেন। তারপর বইটা টেবিলের ওপর ফেলে বললেন, আপনার মলাটের ছাপা বিশেষ সুবিধের হয় নি। তা ছাড়া দেখতে বেশ ভালোই হয়েছে, কী বলেন?

প্রদীপ বইটা তুলে নিয়ে প্রথমেই বইটা শুঁকলো। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে তার ভালো লাগে। অনেকে বলে, ওটা আঠার গন্ধ। কিন্তু শুধু আঠা শুঁকলে তো এরকম মাদক গন্ধ পাওয়া যায় না। যে-কোনো নতুন বই হাতে নিয়েই প্রদীপ আগে এই ঘ্রাণটা নেয়। এটা তার নিজের বই। এর আগে দু'তিনটি সংকলনে তার কবিতা স্থান পেলেও, তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। এ তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, একক কাব্যগ্রন্থ। 'বিষাদ প্রতিমা', মলাটের ঠিক মাঝখানে লেখা, প্রদীপ গুপ্ত। তাদের পারিবারিক পদবী সেনগুপ্ত, কিন্তু প্রদীপ সেনটা বাদ দিয়েছে, শুধু গুপ্ত পদবীটি তার পছন্দ।

মলাট এঁকেছে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু পার্থ। এ মলাট তার খুবই পছন্দ। মলাট ছাপার কোনখানে দোষ হয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না, সব মিলিয়ে তার চমৎকার লাগছে। শুধু ছাপা হলেই তো বই হয় না। বাঁধাবার পরই বইটা একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা পায়।

রহমান সাহেবের দু'হাত জড়িয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে হলো।

রহমান সাহেব বললেন, আপনি এখন ডেলিভারি নেবেন? তা হলে ক্যাশ-মেমো করে দিই? ক্যাশ টাকা এনেছেন তো? আমরা কিন্তু চেক নিই না!

প্রদীপ একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। টাকা? টাকা দেবার কথা তো ছিল না। চেক দেবে কি, প্রদীপের কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টই নেই। আর ক্যাশ টাকা, প্রদীপের পকেটে আছে মাত্র তিন টাকা।

গলা শুকিয়ে গেছে। এরপর কী বলবে তা প্রদীপের জানা আছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

মুকুল প্রেসের মালিকের সঙ্গে প্রদীপের বন্ধু পার্থর খানিকটা চেনা আছে। সেই প্রেসের সঙ্গেই বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রদীপ তার দু'মাসের টিউশানির টাকা ও আরও কিছু টাকা ধার করে কিনে দিয়েছে কাগজ। প্রেসের খরচ আস্তে আস্তে মিটিয়ে দেবার কথা। মুকুল প্রেসের গণেশবাবুর কাছ থেকেই খোঁজ পেয়ে কাল সন্ধেবেলা

তারা এই দফতরিখানায় বই দেখতে এসেছিল।

রহমান সাহেব হাসি হাসি মুখে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে ক্যাশমেমো বইখানা টেনে নিলেন। প্রদীপ বললো, টাকা পয়সার কথা তো গণেশবাবুর সঙ্গে....

অমনি রহমান সাহেবের মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল, ক্যাশ-মেমো বইটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তা হলে গণেশবাবুর কাছ থেকেই বই ডেলিভারি নেবেন!

প্রদীপ একবার ডান পাশে তাকালো। দফতরি দু'জন তার বই পাঁচ খানা পাঁচ খানা করে প্যাকেট বানাতে শুরু করেছে। এই সব তার নিজের বই, অথচ তার এখন হাত দেবার অধিকার নেই। এই সময় পার্থ আর সুবিমল সঙ্গে থাকলে ভরসা পাওয়া যেত।

—বই দেবেন না আমাকে?

—আগে গণেশবাবুর সঙ্গে কথা বলি, উনি পেমেন্টের কী ব্যবস্থা করেন।

একটা বাচ্চা ছেলে বাইরে থেকে এসে এক কাপ চা ও একটা খবরের কাগজ রাখলো রহমান সাহেবের সামনের টেবিলে। এটা বোধহয় প্রতিদিনের বন্দোবস্ত। আর একজন দফতরি দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই খুলে ফেললো গায়ের জামা।

মুকুল প্রেস খোলে দশটার সময়। সেখানকার মালিক গণেশবাবু সাড়ে বারোটার আগে আসেন না। তিনি কি তখুনি দফতরিখানায় লোক পাঠাবেন? কিংবা তিনি যদি বলেন, প্রেসে ছাপার খরচ আমি ধার রাখতে রাজি হয়েছি, কিন্তু বাঁধাই খরচ তো আপনাকেই দিতে হবে। সে টাকা কি আমি গাঁট থেকে দেবো?

রহমান সাহেব নিজের থুতনি চুলকোচ্ছেন। দাড়ি কামানো পরিষ্কার গাল, তবু চুলকোবার কী আছে? ঐ ভাবে ব্যক্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা!

বাঁধাই খরচ কত? সব মিলিয়ে পাঁচশো বই ছাপা হয়েছে। প্রায় ফিসফিস করে প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, আপনার কত হয়েছে?

—আড়াই শো টাকা! পার পীস আট আনা ধরেছি। এ রকম সস্তা রেট অন্য কোথাও পাবেন না!

পীস? প্রদীপের কবিতার বইকে লোকটা....ওর কাছে সব বইই পার পীস? বইখানা যখন উল্টে পাল্টে দেখছিল, তখন একটা লাইনও পড়ে দেখে নি। একদম কবিতা না পড়ে মানুষ বাঁচে কী করে?

—আমি তো সঙ্গে টাকা আনি নি। ভেবেছিলাম গণেশবাবু সব ব্যবস্থা করবেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের খুব চেনা আছে।

—ঠিক আছে। গণেশবাবু বললেই আমরা প্রেসে মাল ডেলিভারি দিয়ে দেবো। ওঁর সঙ্গে তো আর একদিনের কারবার নয়?

প্রদীপ মুখটা নিচু করলো। পীরের বদলে এবার বলতো মান। এরপর জঞ্জাল বলবে কি না তারও ঠিক নেই।

প্রদীপ ভেবেছিল, কফি হাউস খুললেই সে তার বই নিয়ে গিয়ে সবাইকে চমকে দেবে।

আড়াইশো টাকা! টিউশনিতে প্রদীপের মাসে একশো টাকা উপার্জন। তার থেকেই ট্রাম-বাস ভাড়া, হাত খরচ। আড়াইশো টাকা কতদিনে জমবে? পার্থ বলেছিল বই বিক্রি করে প্রেসের ধার শোধ দিলেই হবে। কিন্তু দফ্‌তরিখানা থেকে যদি বই না দেয়, তা হলে টাকা তোলা হবে কী করে?

রহমান সাহেব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছেন।

—আচ্ছা, এখন অন্তত দশ খানা বই দিন?

রহমান সাহেব মুখ তুলে বললেন, দশ খানা? আপনাকে দেবো? কেন?

এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। প্রদীপ তার নিজের লেখা বই চাইতে পারবে না? সেটা অপরাধ? বাকি চারশো নব্বইখানা বই তো থাকছেই, টাকা দিয়ে ছাড়ানো হবে।

—মাত্র দশখানা চাইছি এখন!

—শুনুন, একটা কথা বলি। এসব পদ্যর বই বাজারে চলে না আমি জানি। অনেকে দশখানা বই নিয়ে চলে যায়, বাকিগুলো ডেলিভারি নেয়ই না! আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? গণেশবাবুর সঙ্গে যখন আপনার ব্যবস্থা করা আছে, তখন ওঁকে দিয়েই বলুন গে!

—গণেশবাবু দু'দিন প্রেসে আসবেন না কিনা! উনি বলছিলেন, বাড়িতে বিয়ে না অন্নপ্রাশন কী যেন ব্যাপার আছে!

টপ্‌ করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলে প্রদীপের মুখটা লাল হয়ে গেল। মিথ্যে কথা বলা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু এখন খুব নার্ভাস লাগছে। পার্থ আর সুবিমল সঙ্গে থাকলে সে আরও অনেক গুছিয়ে, বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানাতে পারতো!

বাইরে কিসের যেন একটা গোলমাল হচ্ছে। টিউবওয়েলের সামনে জল নিয়ে ঝগড়া? মেয়েদের গলার আওয়াজই বেশি।

রহমান সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রদীপের দিকে। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। প্রদীপের ভুলটা ধরে ফেলেছেন?

—ঠিক আছে, দু'দিন পরেই নেবেন। মাল তো রেডি হইলোই, দেখে গেলেন!

প্রথম পরিচয়ে লোকটিকে ভাল লেগেছিল, এখন মনে হচ্ছে এমন অর্থ-পিশাচ,

এমন ক্ষমতা-লোলুপ আর হয় না। কবিতা যারা পড়ে না, তারাই এরকম হৃদয়-হীন হয়।

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কাল সন্ধ্যেবেলা রহমান সাহেব তাদের চা খাইয়েছিল, আজ নিজে একা চা খাচ্ছে, প্রদীপকে চা দিতেও বলে নি।

—আচ্ছা, এই এক কপি নিয়ে যেতে পারি? স্যাম্পেল হিসেবে!

—মাপ করবেন। এখনো বউনি হয় নি। সকালে দোকান খুলেই যদি লোককে ফ্রি দিতে শুরু করি।

এর থেকে প্রদীপের গালে ঠাস করে একটা চড় মারলেও সে কম অপমানিত বোধ করতো। তার নিজের বই, একটা কপিও নেবার অধিকার তার নেই। টাকাটাই বড় হলো, কবিতাগুলো লিখতে সে কত রক্ত জল করেছে, তা এরা জানে না।

রহমান সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেছে। সেদিকে আর তাকানো যায় না। আর দাঁড়িয়ে থাকলে লোকটা আরও অপমান করবে। আর কিছু না বলে প্রদীপ পেছন ফিরলো।

তখন একজন দফ্‌তরি তার মালিককে বললো, আন কর্তা, একখানা বই দিয়ে দ্যান। ভদ্দরলোকের ছেলে, সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

—ঠিক আছে নিন, এই একখানা নিয়ে যান!

ঠিক যেন হাত পেতে ভিক্ষে নিচ্ছে প্রদীপ। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। একবার ভাবলো, থাক, দরকার নেই। কিন্তু ততক্ষণে দফ্‌তরিটি বইটা তার হাতে তুলে দিয়েছে।

বাইরে যেতে যেতে সে শুনলো রহমান সাহেব সেই দফ্‌তরিটিকে ধমকে বললে, এই আবদুল, সোভিয়েট দেশের কথা শুনেছিস? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

প্রদীপের মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। বইটার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। পার্থ-সুবিমলকে সঙ্গে না নিয়ে আসাটাই তার ভুল হয়েছে। এ রকম কত ভুল হয় তার জীবনে!

আজ থেকে সে একজন গ্রন্থকার, কিন্তু এখনো কেউ তা জানে না।

খানিকদূর হেঁটে এসে, লোহার রেলিং ডিঙিয়ে সে হেদোতে ঢুকলো। এই সময় অনেক বেঞ্চিই ফাঁকা থাকে। জলের ধারে একটা বেঞ্চে সে বসলো। প্রথম পাতাটা খুললো বইয়ের। পার্থ আর সুবিমল এই দু'জনের নামেই উৎসর্গ করেছে। প্রথম কপিটা সে পার্থকে দেবে ভেবেছিল, পার্থই সাহায্য করেছে

সবচেয়ে বেশি। অবশ্য সুবিমল পার্থর চেয়ে কবিতা অনেক ভালো বোঝে। সুবিমল তার দু' একটা উপমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। সুবিমলের কাছে সে ঋণী।

এই বইটা সে কাকে দেবে? আর কোনো কপি অন্তত দু' চারদিনের মধ্যে পাওয়ার আশা নেই।

একবার মনে পড়লো নিরঞ্জনদার কথা। নিরঞ্জন চৌধুরী অনেক সিনিয়র কবি। একটা পত্রিকার সম্পাদক, প্রদীপকে স্নেহ করেন, উৎসাহ দেন। নিরঞ্জনদাকে তার বই দেবার কথা বলে এসেছিল।

কিন্তু এই একটা মাত্র কপি, সে যদি পার্থ বা সুবিমলকে না দিয়ে নিরঞ্জনদাকে দিয়ে আসে, তাহলে সে খবর কফি হাউসের অন্য বন্ধুদের ঠিক কানে যাবে। ওরা বলবে, প্রথম কপিটাই নিরঞ্জনদাকে? এস্টাব্লিশমেন্টের পায়ে তেল দিচ্ছিস, অ্যাঁ?

হঠাৎ ইচ্ছে হলো বইটাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

তার বই বেরিয়েছে, অথচ বেরোয় নি। বই ছাপা হয়েছে, কিন্তু সে বই দপ্তরির গুদামে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে। তার লেখাগুলোর কোনো মূল্য নেই।

এক সময় সে উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলো। কোথায় যাচ্ছে, সে জানে না। শম্পা তার কবিতা ভালোবাসে। একবার শম্পা তার কবিতা পড়ে একটা চিঠি দিয়েছিল। শম্পা থাকে শ্রীরামপুরে। কিন্তু প্রদীপের এখন শ্রীরামপুরের কথা মনে পড়ছে না।

বিবেকানন্দ রোড পার হয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে খানিকটা যাওয়ার পর প্রদীপ একটি বাড়ির দোতলায় উঠে গেল। এক তলার দরজা খোলাই থাকে, দোতলার দরজা বন্ধ। প্রদীপ বেল বাজালো।

যদি এ বাড়ির কাজের লোকটি কিংবা রাঁধুনী বুড়িটি দরজা খুলতো, তাহলে প্রদীপ ফিরে যেত সেখান থেকেই। কিন্তু দরজা খুললেন এক মহিলা। পঁয়তিরিশ ছত্রিশ বছর বয়েস, ঘরোয়া ভাবে শাড়ি পরা, মাথার চুল ভিজে, হাতে একটা তোয়ালে।

গভীর বিস্ময়ে ভুরু তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, প্রদীপ তুমি? হঠাৎ এই সময়ে?

প্রদীপও বিস্মিত ভাবে বললো, পিন্টু-রিনা, ওরা নেই?

—আজ কী বার?

—আজ কী বার?

রবিবার আর বৃহস্পতিবার সকালে প্রদীপ এই বাড়িতে পিন্টু আর রিনা নামে দুটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে পড়াতে আসে। সেই দু'দিন ওদের ছুটি থাকে।

আজ মঙ্গলবার।

প্রদীপ সেটা ভুলে গেছে না জেনে শুনেই এসেছে, তা সে নিজেই যেন এখন ঠিক করতে পারছে না।

সে আড়ষ্ট গলায় বললো, কেন যেন মনে হয়েছিল, আজ ওদের ছুটি থাকবে।

মহিলাটি হেসে ফেলে বললেন, তোমারও দেখছি আমারই মতন ভুলো মন! এসো। ভেতরে এসো।

—না, তাহলে আমি যাই!

—এসেছো, চলে যাবে কেন? একটু বসো, চা খেয়ে যাও! স্বামী বেরিয়ে যান আটটার মধ্যে, রিষড়ার একটি কারখানায় যেতে হয় তাকে। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় সাড়ে আটটায়। তারপরেই মানসীর অফুরন্ত খালি সময়। এক একদিন তিনি এলগিন রোডে তাঁর বাপের বাড়ি যান এই সময়, আজ সেই দিন নয়। কাজের লোকটিকে বাজারে পাঠানো হয়েছে, রাঁধুনী ছুটি নিয়েছে তিন দিন।

দোতলার ফ্ল্যাটটি একেবারে নিস্তব্ধ।

প্রদীপ এসে বসলো বসবার ঘরে, মানসী নিজেই চায়ের জল বসাতে গেলেন।

বসবার ঘরটি বেশ ঝকঝকে ভাবে সাজানো। ফুলদানিতে দু'তিন রকমের টাটকা ফুল। সাদা, লাল ও বেগুনি। ছাদে মানসীর টবের ফুলগাছের বাগান আছে।

প্রদীপের বইয়ের মলাটটা সাদা আর বেগুনি। আর একটা রং তার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাই কালার ব্লকে খরচা বেশি। প্রদীপ ফুলের গুচ্ছের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এ বাড়িতে প্রত্যেক দিনই সে টাটকা ফুল দেখে।

প্রদীপের এক বন্ধুর এটা কাকার বাড়ি। তার কাছ থেকেই প্রদীপ টিউশানিটা পেয়েছে। সেই সূত্রে মানসীকেও সে কাকীমা বলে।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মানসী আবার ঘরে ঢুকে বললেন, প্রদীপ, তোমার ক্লাস নেই আজ?

এম এ পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাসে প্রদীপের নাম লেখানো আছে, কিন্তু প্রদীপ প্রায়ই যায় না। তার ভালো লাগে না। বাড়িতে সে বলে রেখেছে, সে চাকরি খুঁজছে। কলকাতার বাইরে, খুব ছোট কোনো জায়গায় সে একটা চাকরি চায়।

প্রদীপ বললো, না।

—তোমার চোখ লালচে লালচে দেখাচ্ছে কেন? রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি বুঝি?

প্রদীপ কিছু উত্তর না দিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মানসীর দিকে। মানসীর

মুখখানা এখন ফুলের মতনই টাটকা। প্রদীপের চেয়ে মানসী বয়েসে অন্তত চোদ্দ-পনেরো বছর বড়ো। কিন্তু তাকে দেখে তার বয়েস বোঝা যায় না। এর আগে প্রদীপ কখনো মানসীকে একলা ঘরে এতক্ষণ তাকিয়ে দেখে নি।

মানসী আবার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। প্রদীপ এক জায়গায় বসে রইলো স্থির হয়ে। কাছেই রয়েছে আজকের দুটি খবরের কাগজ, প্রদীপের তা দেখতেও ইচ্ছে হলো না।

চায়ের দুটি কাপ এনে রাখলেন মানসী। সঙ্গে একটা বিস্কুটের কৌটো।

তিনি বললেন, তোমাকে একটা ডিম ভেজে দেবো? বিস্কুট ছাড়া আর তো কিছু নেই।

প্রদীপ প্রথমে বললো, না, না, লাগবে না!

তারপর মুখ তুলে বললো, আপনি নিজে চা করলেন? বাড়িতে কেউ নেই?

মানসী হেসে উত্তর দিলেন, না কেউ নেই। খাদুনদি ছুটি নিয়েছে। এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানসীকে একেবারে অন্য চোখে দেখলে প্রদীপ। মানসীর স্বামী নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, বাপ-মা নেই, সে একা। সে এখন শুধু প্রদীপের। এই নির্জনতায় তার রূপ অনেক বেশি খুলে গেছে। প্রদীপ মনে মনে মানসীর এই রূপ অনেকবার দেখেছে। আজই প্রথম বাস্তবে দেখলো।

আজ ভোরবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতার বইটার কথা মনে পড়বার পরেই কি মানসীর মুখখানা একবার তার চোখে ভেসে ওঠে নি? সেই সময় কার্যকারণটা মনে আসে নি তার।

—নাও, চা নাও!

বইটা সামনে এনে প্রদীপ বললো, কাকীমা, আমার একটা কবিতার বই বেরিয়েছে, আপনার জন্য এনেছি... আপনি দেবেন?

মানসী ভুরু তুলে, সাদার ওপর লাল রঙের মতন, বিস্ময়ের সঙ্গে খুশী মিশিয়ে বললেন, কবিতার বই? তোমার? ওমা, তুমি কবিতা লেখো বুঝি? আগে কোনোদিন বলো নি তো?

বইটা তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বইটা!

প্রদীপ মানসীর শরীর থেকে একটা সুন্দর গন্ধ পেল। এটা কোনো পারফিউমের গন্ধ নয়, মানসীর নিজস্ব গন্ধ।

মানসী বইটা খুলে প্রথম কবিতাটায় একটুক্ষণ চোখ রেখে বললেন, বাঃ, খুব সুন্দর লিখেছো। তিনি একটা লাইন উচ্চারণ করে পড়লেন।

মানসী কখনো শখ করে কবিতা পড়েন না। তিনি তাঁর সুন্দর শরীরটা আরও সুন্দর করে তোলার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাঁর শখ পাহাড়ে বেড়াতে

যাওয়া, ও নানারকম পোশাক কেনা। তাঁর স্বামীর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যে সমাজ সেখানে বাংলা কবিতা ভুলেও ছায়াপাত করে না কখনো।

তবু তিনি জানেন যে কেউ একটা বই উপহার দিলে উৎসাহ দেখাতে হয়। কেউ নিজের লেখা বই দিলে শুধু মলাটের প্রশংসা না করে তার সামনেই পড়তে হয় কিছুটা।

তিনি পড়লেন, এই নদী, বিকেলের ছায়াপথ, ঘরে ফিরছে মন সেই বাঁক...।

পড়তে পড়তে তিনি পাকা অভিনেত্রীর মতন আন্তরিক গলায় বললেন, বাঃ চমৎকার তো...।

হঠাৎ ঘরটাতে মানসীকে ঘিরে যেন অনেকখানি আলো জ্বলে উঠলো। মানসীর মুখ যেন মুক্তো দিয়ে গড়া। পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই, শুধু মানসী ছাড়া, সে পড়ছে প্রদীপের কবিতা।

খানিক আগে প্রদীপ নক্ষত্রবিথানা থেকে তার এক কপি বই ভিক্ষে নিয়েছিল। এখন সে যেন দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে, এক অপরূপ পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এলো একটি নতুন ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার জলস্রোতের শব্দ তার কবিতার লাইনের মতন...।